প্রথম অধ্যায়

বরাক উপত্যকার পরিচয়—কিছু কথা

"And therefore I have sailed the seas and come
To the holy city of Byzantium "[1]
('Sailing to Byzantium'–W.B.Yeats)

নাবিকের মতো অনেক সমুদ্র ভ্রমণ পরিভ্রমণ করে আয়ার্লেন্ডের জাতীয় কবি ফিরে এসেছেন তাঁর স্বপ্নের জায়গা বাইজান্‌তিয়ামে! আমিও অনেক কিছু ভেবে চিন্তা করে অবশেষে ফিরে এলাম 'বরাক উপত্যকা' অর্থাৎ আমার 'বাইজান্‌তিয়াম'। এটা আমার স্বপ্নের জায়গা, কল্পনার অঞ্চল, পবিত্র ভূমি। এই অধ্যায়ে এই অঞ্চলের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক, ভাষিক দিক দিয়ে অর্থাৎ সামগ্রিক একটা পরিচয় তুলে ধরা হবে। আনুষাঙ্গিক ও প্রাসঙ্গিক কারণে অন্যান্য অঞ্চলের কথা আসবে। যাতে বরাক উপত্যকার পরিচয়ের সামগ্রিক একটা রূপরেখা ফুটে ওঠে সুন্দর ও পরিষ্কার হয়ে। তবে এই পরিচয় আবিষ্কার করতে গিয়ে শ্রীহট্টকে আলাদা করে নিলে হবে না—এক সঙ্গেই আলোচনা করতে হবে। কারণ শ্রীহট্ট ও বরাক উপত্যকা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।

ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক পটভূমি

বরাক উপত্যকার ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি, ভাষা সুপ্রাচীন গভীর ঐতিহ্যশীল, পরম্পরাগত। খণ্ডিত এই অঞ্চলের (শ্রীহট্টের) কথা ভেবে দুঃখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আফ্‌সোস করে লিখেছিলেন—

"মমতা বিহীন কালস্রোতে
বাঙলার রাষ্ট্রসীমা হতে
নির্বাসিতা তুমি
সুন্দরী শ্রীভূমি।
ভারতী আপন পূণ্য হাতে
বাঙালির হৃদয়ের সাথে
বাণীমাল্য দিয়া
বাঁধে তব হিয়া
সে বাঁধনে চিরদিন তরে তব কাছে
বাঙলার আশীর্বাদ গাঁথা হয়ে আছে"[১]

এই 'সুন্দরী শ্রীভূমি'র একটুকরো করিমগঞ্জ আজ বরাক উপত্যকার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বাকি বৃহত্তর অংশটা দেশভাগের ফলে বাংলাদেশের বুকে থেকে গেল চিরতরে। কাছাড় ও শ্রীহট্ট এই জেলা দুটি ১৮৭৪ সালে তখনকার বৃটিশ সরকার বঙ্গদেশ থেকে সরিয়ে দিল এবং ব্রিটিশ রাজত্বে এই দুটি জেলাকে এক নতুন নামে গ্রহণ করা হল—সুরমা ভ্যালি ডিভিশন। তার কারণ এ উপত্যকার মূল নদী 'বরাক' করিমগঞ্জে সুরমা ও কুশিয়ারা এই দুই শাখায় ভাগ হয়ে শ্রীহট্টে প্রবেশ করেছে। সুরমার তীরে অবস্থিত শ্রীহট্ট শহর তখন ছিল সমগ্র উপত্যকার প্রাণকেন্দ্র। একটা কথা মনে রাখতে হবে ১৮৭৪ সালের পূর্বে শ্রীহট্ট আসামের অন্তর্গত ছিল না। তা আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি। কারণ এর আগে শ্রীহট্ট আসামের অন্তর্গত ছিল এর কোনো প্রমাণ কোথাও নেই। এ ছাড়া শ্রীহট্টের ভাষা, সমাজ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, পরম্পরা, ইতিহাস ইত্যাদিও সুসম্পূর্ণ শ্রীহট্টীয় কিন্তু। আজও তা অমর, অটল, অক্ষয়, অনুপম।[২]

স্বাধীনতার পরে শিলচর, হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ ও হাফলং (বর্তমান উত্তর কাছাড়) এই এই চারটি মহকুমা নিয়ে

ছিল কাছাড় জেলা। ১৯৫৩ সালে হাফলং মহকুমাকে কাছাড় থেকে সরিয়ে নিয়ে জুড়ে দেওয়া হল মিকির (কার্বিআংলং) পাহাড়ের সঙ্গে। তখন থেকেই অবিভক্ত সুরমা উপত্যকায় যে সমতল অংশ থেকে গিয়েছিল তা কাছাড় জেলা নামেই প্রশাসনিক পরিচিতি লাভ করে। কিন্তু ১৯৮৪ সালে করিমগঞ্জ ও ১৯৮৯ সালে হাইলাকান্দি মহকুমা জেলা স্তরে উন্নীত হওয়ার পর এই অঞ্চল আবার 'বরাক উপত্যকা' নামে আত্মপ্রকাশ করেছে।[৩] এই ভাঙাগড়ার গভীরে যদিও ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, আঞ্চলিক, ভাষিক, অর্থনৈতিক স্বার্থ ও সুবিধা লুকিয়ে রয়েছে।

বর্তমান বরাক উপত্যকার ইতিহাসের কথা জানতে হলে তিনটি দিক গভীরভাবে দেখতে হবে (অনুসন্ধান করতে হবে) যেমন ভৌগোলিক অবস্থা/অবস্থান, জনবিন্যাস ও ঐতিহাসিক তথ্য। অতি প্রাচীনকালে ভারতীয় আর্যগোষ্ঠীর জনজাতিরা উত্তর ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গ হয়ে বরাক সুরমা শ্রীহট্টে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এখানে এসে তাদের যাত্রা থেমে গিয়েছিল প্রতিবন্দী পর্বতমালার পাদদেশে। কারণ লাঙ্গল প্রথার উত্তরাধিকারীর কাছে পাহাড় পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত, প্রতিকূল। সম্ভবত পর্বতশ্রেণী তখনও ছিল ভারত-মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত। তাই এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল। অন্যদিকে পর্বতবাসীদের সমতলে নেমে আসার প্রতি স্বভাবজাত অনীহা ছিল। কারণ বন্যা বিধ্বস্ত এই সমতল অঞ্চল জুম চাষের প্রতিকূল। জলবিহিন সমতলভূমি তাই ছিল আগুন্তুক ভারত-আর্য লোকদের বসবাসের জন্য খুবই অনুকূল। সে জন্যই তাদের বসবাস স্থাপিত হয় এখানে। উপত্যকার এই সব জনজাতিরা তাদের সঙ্গে নিয়ে এলেন লাঙ্গল প্রথার সমস্ত কলাকৌশল। নদী নালা খাল বিলে ভরা বরাক সুরমা উপত্যকার আবাদিহীন উর্বর জমিতে কৃষিকার্য হয়ে উঠল তাদের প্রধান জীবিকা। উপত্যকার প্রান্তিকায়িত অঞ্চলগুলিতেও ক্রমে জনবসতি গড়ে উঠল।[৪]

এখানে একটা কথা মনে পড়ে পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলিও কিন্তু নদীর পারে গড়ে ওঠেছে। যদি মনে করি নীল নদের পারে গড়ে ওঠা মিশরীয় সভ্যতার কথা বা রাবীর পারে গড়ে ওঠা হরস্পা সভ্যতার কথা বা ইউফ্রেট্স ও টাইগ্রিস নদীর পারে গড়ে ওঠা মেসোপটোমিয়া সভ্যতার কথা বা ইয়াংসিকিয়াং ও হোয়াংহো নদীর পারে গড়ে ওঠা চিনা সভ্যতার কথা। মিলিয়ে দেখলে একটু অন্যরকম আনন্দ লাগে, ভালো লাগে। এখানেও সভ্যতা গড়ে ওঠেছে অই সব সভ্যতার মতো—জনবসতি জাতি সংস্কৃতি ইতিহাস সমাজ ইত্যাদি। তবে একটু অন্যরকম করে একটু অন্যরকমভাবে।

বরাক-সুরমা উপত্যকার চন্দ্রপুরী বিষয়া পঞ্চম-সপ্তম শতাব্দীতে কামরূপের অন্তর্গত ছিল সে ব্যাপারে নিধনপুর তাম্রশাসন একটি অকাট্য প্রমাণ। কিন্তু সম্পূর্ণ উপত্যকা যে কামরূপে ছিল না তার অনেক প্রমাণ আছে। ভাস্কর বর্মার রাজত্বকালের চীনা পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙ লিখেছেন যে তখন শ্রীহট্ট একটা স্বতন্ত্র্য রাজ্য ছিল। এই শিলিচটল বা শ্রীহট্ট সমতটের উত্তরপূর্বে অবস্থিত ছিল বলে ঐতিহাসিকদের ধারণা।[৫]

শ্রীহট্টের মৌলবিবাজারের রাজনগর সীমার অন্তর্গত পশ্চিমভাগ গ্রামে প্রাপ্ত বিক্রমপুরের চন্দ্রবংশীয় মহারাজ শ্রীচন্দ্রের দশম শতাব্দীর একটা তাম্রশাসন বরাক-সুরমা উপত্যকার ইতিহাসের এক মহত্বপূর্ণ দলিল। শ্রীহট্ট তখন সমগ্র বরাক সুরমা উপত্যকা ও প্রতিবেশী অঞ্চল নিয়ে বিস্তারিত ছিল। এই তাম্রশাসনের বর্ণনা অনুযায়ী চন্দ্রপুর নিঃসন্দেহে নিধনপুর লিপির চন্দ্রপুরী। ভটেরায় প্রাপ্ত ঈশান দেব ও গোবিন্দ কেশবদেবের একাদশ শতকের তাম্রশাসন এই উপত্যকার ইতিহাসের আরও দুটা অমূল্য সম্পদ। গোবিন্দ কেশবদেব ও তার পুত্র ঈশানদেব দুজনই শ্রীহট্টের রাজা ছিলেন। শ্রীহট্টের নামে সার্বভৌম স্বাধীন রাজ্যের উল্লেখ ভটেরায় তাম্রশাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।[৬]

উপরে উল্লিখিত এই সব ক'টা তাম্রশাসনে সুরমা বরাক উপত্যকার ইতিহাসের ছিন্ন পৃষ্ঠার মতো হলেও খৃস্টীয় পঞ্চম থেকে একাদশ শতকের ইতিহাস রচনায় এদের মূল্য অপরিসীম। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে খৃস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে সময়ে সময়ে বরাক সুরমা উপত্যকা দক্ষিণ পূর্ববঙ্গের হরিকেল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর ময়নামতী তাম্রশাসনে হরিকেল দেবের উল্লেখ আছে আর ত্রিপুরা, কুমিল্লা, শ্রীহট্ট অঞ্চলে অসংখ্য

হরিকেল মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। এই মুদ্রাগুলির মধ্যে 'বরাকো', 'বেরাকো' ইত্যাদি লিখিত অনেক মুদ্রাও আছে। অনেক গবেষকদের অনুমান সে সব শব্দ থেকে 'বরাক' শব্দ বা 'বরাক' অঞ্চলটির নামের উৎপত্তি।[৭]

কাছাড়ি জাতির সংস্কৃতির ধারক ও বাহক কাছাড় শব্দটি। আর তার প্রকাশ মাধ্যম বাংলা ভাষা ছিল—আজও বহমান। কাছাড়ি শব্দ থেকে কাছাড় জেলার নামকরণ হয়েছে এবং যে নদী বরাকবাসীর বুকে বহমান সেই বরাক নদীটির নামও ডিমাসা ভাষাশব্দ থেকে এসেছে। ডিমাসা শব্দের অর্থ হল ডি-জল, মা-সুবৃহৎ, ছা-সন্তান। অর্থাৎ সুবৃহৎ জলের সন্তান। বরাক নদীর বাঁক, আকৃতি, প্রকৃতি, বৎসরের বিভিন্ন রূপ, ইত্যাদির দিক দিয়ে দেখে বিচার করলে বরাক নদীর নাম 'ডিমাসা' শব্দের প্রতিশব্দ বা সমার্থক হয়ে যায়। আজও এই অভিমত অনেকে বিশ্বাস করেন।[৮]

বরাক উপত্যকার ইতিহাসের মূল কাঠামো তৈরি হয়ে গেছিল সুদূর প্রাচীনকালেই। আর এই কাঠামো সবচেয়ে শক্তিশালী যে প্রভাবটি লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে এই উপত্যকার ভৌগোলিক অবস্থান। সেই যুগের তাম্রশাসনে আমরা যে শর্মা, ভট্ট, দত্ত, দাস, ঘোষ, ধর, কর, পাল, দাশ, নন্দী, প্রভৃতিদের পেয়েছি তারাই আজকের বরাকের (বাংলাভাষীর) পূর্বপুরুষ। ভৌগোলিক ও সামাজিক কারণেই এই উপত্যকা পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব বঙ্গের সমতট, বঙ্গ, হরিকেল ইত্যাদি রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে ইতিহাসের বুকে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল। ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে শ্রীহট্ট কাছাড় নিয়ে স্বাধীন শ্রীহট্টের আবির্ভাবের অনেক আগে থেকেই এই উপত্যকা ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ভাষিক বৈশিষ্ট্যে বঙ্গভূমি থেকে অভিন্ন হয়ে পড়েছিল।[৯]

বরাক উপত্যকা তথা সমগ্র শ্রীহট্টের (প্রায় পুরো বাংলাদেশের) সাধারণ মুসলমান সম্প্রদায়ের মনে আজও শ্রীহট্ট নাম সম্পর্কে এক কিংবদন্তি চলে আসছে সুদূর প্রাচীন কাল থেকে যে শ্রীহট্টের নামকরণ পীর শাহজালাল য়মণির দ্বারা হয়েছে। আমরা জানি যে নবম দশম শতকে সুরমা-বরাক উপত্যকায় কয়েক ঘর মুসলিম পরিবার ছিলেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় গৌড়গোবিন্দ ও বুরহান উদ্দিনের কিংবদন্তিতে।[১০]

বুরহান উদ্দিন পুত্রের জন্মানুষ্ঠানে গো-বলিদান করেছিলেন। মুসলিম ধর্মবিধানে এই বলিদানকে 'আকিকা' বলে। আর এইখান থেকে একটুকরা গোমাংস একটা কাক নিয়ে ফেলেছিল গৌড়গোবিন্দের রাজদরবারে অর্থাৎ দৃষ্টিগোচর জায়গায়। ফলে রাজা গৌড়গোবিন্দ গো-হত্যার অপরাধে বুরহান উদ্দিনের এক হাত কেটে দিলেন। ফলে য়মন দেশ থেকে দিল্লিতে আগত পীর শাহজালাল এই মর্মান্তিক ঘটনা শুনে শ্রীহট্টের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন তিনশত ষাট আউলিয়াসহ। এখানে এসে দেখলেন ভরা নদী ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা জলে উৎলাচ্ছে।[১১] তারপর লোক বিশ্বাস অলৌকিক গুণে তাঁরা পার হয়ে গেলেন। গৌড়গোবিন্দ এই অলৌকিক কর্মকাণ্ড শুনে রাজ্যের রাজমহলের চারদিকে চাল ছিটিয়ে দিলেন। যাতে শস্যের মধ্যে পা/পাড়া দেওয়ার অপরাধবোধে রাজাট্টালিকায় প্রবেশ করতে না পারেন।[১২]

নিজামুদ্দিন পায়রা দিয়ে শাহজালালকে বরণ করেছিলেন দিল্লিতে। কিন্তু পীর শাহজালাল য়মণি কবুতর খুব ভালোবাসতেন। তার বেগের ভেতরে কবুতরের একমুঠি পালক ছিল। তিনি নাকি এগুলি ধরে ঢিল মেরে দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে একঝাঁক কবুতর হয়ে গেল এই পালকগুলি। সমগ্র বাংলাদেশ সহ বরাক উপত্যকার কোণায় কোণায় এই জাতিও কবুতর দেখা যায়। এগুলির নাম 'জালালি পায়রা' বা 'জালালি কবুতর'। এই সব কবুতরের রঙ কাজলা রংও গঠন একই রকম হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে এই পায়রা খাদ্য হিসেবে এক সময় নিষিদ্ধ (হারাম) ছিল। আজও তা অনেকে মেনে চলে।[১৩] এবং তিনি যে দিকে যাবেন (রাজাগারের দিকে) তার অনুচরসহ কবুতরগুলি শস্যের দানা খেয়ে খেয়ে পথ পরিষ্কার করে দিচ্ছে। এই দেখে গৌড়গোবিন্দ রাজমহলের সিংহদুয়ার প্রকাণ্ড পাথর দিয়ে বন্ধ করে রাখলেন। এই সব দেখে পাথরকে পীর শাহজালাল য়মণি রাগ করে বললেন 'শিল-হট্ যা'। এ শব্দ থেকেই প্রাকৃতায়নে 'শ্রীহট্ট' নাম হয়েছে পরবর্তীতে। বিনা রক্তপাতে শ্রীহট্ট জয় করলেন শাহজালাল। এই লোকবিশ্বাস ও ইতিহাস আজও অটুট রয়েছে কিংবদন্তি হয়ে। এবং শ্রীহট্ট, কাছাড়ের (অবিভক্ত) প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্তও এই সব আলোকপ্রাপ্ত গুণীজনের

অলৌকিক কর্মকাণ্ড নিয়ে বিভিন্ন রকমের লোকসঙ্গীত, লোককথা প্রচলিত আছে আজও।

এই 'শিল হট্ যা' শব্দ আর কামরূপের রাজা ভাস্কর বর্মার আমলে আগত চিনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ-এর বর্ণিত স্বাধীন স্বতন্ত্র (শ্রীহট্ট) 'সিলিচটল' শব্দের শারীরিক গঠনে মিল আছে। বুরহান উদ্দিন আর গৌড়গোবিন্দের কাহিনি যে শ্রীহট্টের তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।[১৪]

আর বাকি রইল পীর শাহজালাল য়মণির লৌকিক ও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ। এগুলি কতটুকু প্রমাণিত জানা কঠিন। কিন্তু শাহজালাল য়মণি তাঁর অনুচরসহ শ্রীহট্ট জয় করে মুসলিম রাজ্য কায়েম করেছিলেন তার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। ইতিহাস তো মানুষই নির্মাণ করে, বিনির্মাণ করে, পুনর্নির্মাণ করে আর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ঐতিহাসিকের হাতে কাছে একই ইতিহাস বিভিন্ন রকম হয়।[2] সে যাই হোক শাহজালাল য়মণি তাঁর আউলিয়াসহ কিভাবে বা কীরকম করে শ্রীহট্ট জয় করেছিলেন সেই লোকবিশ্বাস তো আমরা বদলাতে পারি না। তাই কিংবদন্তিকে মেনে নিয়েই এগিয়ে চলা আমাদের কাজ। এই কিংবদন্তি আজ প্রায় ইতিহাসে পরিণত।

কিন্তু ঐতিহাসিকেরা বলেছেন যে 'হট্টনাথের পাঁচালী'র সাক্ষ্য অনুসরণ করে 'কৃষক রাজবংশ'এর চতুর্থ রাজা গুহকের তিনপুত্র ছিলেন এবং দুই কন্যা, শীলা ও চটলা। আমরা জানি প্রাচীন কালেও বর্তমান কালের মত কন্যার নামে অনেক স্থান নাম, নদীর নাম হয়েছে। কিন্তু ঐতিহাসিক কমলাকান্ত গুপ্ত বলেছেন যে এই গুহক রাজার কন্যা শীলার নামে রাজধানীর কাছে 'শীলাহট্ট' নামে একটি হাট (বাজার) স্থাপন করেছেন এবং কন্যা চটলাকে কলুষিতা হওয়ার জন্য দক্ষিণসাগরের দ্বীপে নির্বাসন করেছেন। কন্যা চটলা চটল রাজ্য বিস্তার করে। এই শীলা ও চটলার নামে পরবর্তীকালে 'শিলিচটল' রাজ্যের উদ্ভব বিকাশ বিস্তার।[১৫]

তা না হলে ভাস্কর বর্মার আমলের পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ 'শিলিচটল' দেশ কোথায় পাবেন? 'বরবক্র' থেকে যেমন বরাক হয়েছে ঠিক তেমনি 'শিলিচটল' থেকেই শ্রীহট্ট নাম হওয়া মুটেই অসম্ভব নয়। এবং এই শ্রীহট্ট স্বাধীন রাজ্য ছিল তখনও। তবে একটা কথা নামটি প্রাকৃতায়নে হয়েছে। এটা আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়।

আরও একটা কথা, বৌদ্ধ তন্ত্রযান 'সাধন মালা' গ্রন্থে যে চারটি তন্ত্রপীঠের কথা উল্লেখ হয়েছে তাতে 'শ্রীহট্ট' এর উল্লেখ আছে। কামাখ্যা ও শ্রীহট্ট সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নেই। প্রায় পনেরোশ ষোলশ শতাব্দীতে রচিত 'যোগিনীতন্ত্র' গ্রন্থের মধ্যে শ্রীহট্ট স্বতন্ত্র রাজ্য হিসেবে উল্লেখ আছে। এই সব থেকে শ্রীহট্ট ও তার পাশাপাশি কাছাড়ের প্রাচীনত্বের গভীর সংকেত পাচ্ছি আমরা। হয়তবা শ্রীহট্ট তখনকার সভ্যতার একটি প্রধান প্রাণকেন্দ্র স্থল হয়ে ওঠেছিল।[১৬]

শ্রীহট্টের নাম ও সভ্যতা অতি প্রাচীন এতে কোনও সন্দেহ হতে পারে না। তবে এটা সত্য শ্রীহট্ট কাছাড় বিভিন্ন সময়ে, রাজবংশে, রাজত্বে, বিভিন্ন রাজ্যের (বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, কামরূপ ইত্যাদির) অন্তর্ভুক্ত, বহির্ভুত হয়েছে—হয়েছে আংশিক গৃহিত ও বর্জিত। কিন্তু একাদশ ও দ্বাদশ শতকে শ্রীহট্ট সার্বভৌম, স্বাধীন রাজ্য ছিল। এই ক্ষেত্রে প্রায় বেশির ভাগ ঐতিহাসিক বিশেষ করে পুরাতাত্ত্বিকদের সমর্থন পাওয়া যায়।

যোড়শ শতাব্দীতে কাছাড়ে (সমতল) ত্রিপুরী রাজত্বের অবসান হওয়ার সাথে সাথে কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের ভাই ও সেনাপতি চিলা রায় আসাম, খাইরেম, ডিমারুয়া ও মাইবং (ডিমাসা রাজ্য) রাজ্যের রাজাদের পরাজিত করে সমতল কাছাড়ে আসেন। সমতল কাছাড়ে (বর্তমান কাছাড় জেলা) কোচবিহারের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু কিছু কাল যাওয়ার পর চিলা রায়ের মৃত্যুর পর পূর্বে পরাজিত রাজারা আবার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই সুযোগে কাছাড়ে স্বাধীন খাসপুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন নরনায়াণের ভ্রাতা রাজা কমলনারায়ণ। প্রাচীন ব্রহ্মপুর প্রথম কোচপুর এবং পরে খাসপুর নামে পরিচিতি লাভ করে। এই খাসপুরে (ঠালিগ্রামে) শ্যামা মন্দির ও উদারবন্দের কাঁচাকান্দি মন্দির আজও দেহান (কোচ) রাজত্বের শেষ স্বাক্ষর বয়ে নিয়ে যাচ্ছে কালের যাত্রায়।[১৭] আবার খাসপুর নামকরণে ভিন্ন মতও আছে যে মাইবং রাজ্যশাসন অবস্থানকালে কাছাড় 'ধেয়ান'-কে (কোচবংশধরকে) কাছাড়ী 'খুসুছা' বলে ডাকত

এবং তাদের রাজধানীকে খুসুপুর কালক্রমে এই খুসুপুর-এর বর্তমান নাম হয় খাসপুর।[১৮]

শ্রীহট্ট কাছাড়ের ঐতিহাসিক তথ্য, প্রাচীন পুথি, শিলালিপি, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, জনশ্রুতি, মৌখিক কথা প্রভৃতির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে শ্রীহট্ট কাছাড় অতি প্রাচীনকালে বিভিন্ন রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তার ততটা প্রমাণ নাই। যেমন বর্তমানে দেশে বিভিন্ন রাজ্য জেলা ভেঙে স্বতন্ত্র রাজ্যে ও জেলায় পরিবর্তন হচ্ছে। যদি তার প্রাচীন ইতিহাস খুঁজতে যাই তবে বিভিন্ন সময়ে উত্থান পতন গ্রহণ বর্জন পাব। কোথাও আংশিক, কোথাও একটু বড় অংশ আবার কোথাও কম। ঠিক সে রকম শ্রীহট্ট কাছাড়ও একদিন ছিল।[১৯]

কিন্তু পঞ্চম শতাব্দীতে ত্রিপুরীরা সম্ভবত রাজ্যশাসন করতেন নিজের মত করে। তবে বিভিন্ন সময় পার্বত্য জাতির দৌরাত্ম্যে, আক্রমণে বারবার রাজধানী পরিবর্তন হয়েছে। সে জন্য রাজ্যবিস্তার ততটা প্রসারিত ও মজবুত হয়নি। এবং তারমধ্যে কাছাড়ী জাতির রাজ্যও ছিল— রাজধানীও। ১৪০৭ সালে রচিত 'ত্রিপুরা-রাজমালা' তার সাক্ষী দেয়। এই রাজবংশের ঐতিহাসিক তথ্য ততটা নেই। সে জন্য নিশ্চিত ও নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যায় না। তবে একটা জিনিস সুস্পষ্ট কোচ রাজবংশের আক্রমণে ও রাজ্য বিস্তারে ত্রিপুরা রাজ্যের শাসন কাছাড়ে শেষ হয়ে যায়। ১৫৩৪ সালে কোচ রাজবংশ প্রতিষ্ঠাতা বিশ্ব সিংহের বড় ছেলে নরনারায়ণ সিংহাসন প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় ছেলে শুক্লধ্বজ বা চিলারায়ের আক্রমণে আসাম কাছাড় অধিকার করেন। আহোমেরা অন্যান্য জাতির দ্বারা পরাজিত হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট রাজ্য স্থাপন করেছিল। জয়ন্তিয়া, ডিমারুয়া, মণিপুরি ও খৈরিমের রাজারা বিনা যুদ্ধে সন্ধি করে নিল চিলারায়ের সঙ্গে।[২০]

রাজা নরনায়াণের অপর ভাই কমলনারায়ণ বা কমলগোহাই কাছাড়ের প্রথম ধেয়ান রাজা। তিনি শান্ত ও ধার্মিক ছিলেন। জয়ন্তিয়া ও পার্বত্য জাতির উপদ্রবে রাজ্যের বিস্তৃতি খাসপুরের নিকটেই নিবদ্ধ হয়ে পড়ে। তবে ত্রিপুরার আধিপত্য কাছাড়ে লোপ পেয়ে গেল। তাঁর আমলে শ্যামা, কাঁচাকান্তি, মাল, ভৈরব, রণবাউলী, আন্ধেরি প্রভৃতি দেবীদেবতার পূজা উপাসনা করা হত। তাঁর পর আরও দু'জন ধেয়ান রাজা রাজত্ব করেন কিছু দিন। কিন্তু তাঁরা রাজ্য বিস্তার ও পরিচালনায় অভিজ্ঞ ও নিপুণ না থাকায় অল্পদিনের মধ্যেই কোচ রাজত্ব বিলুপ্তির পথ বেয়ে কালের স্রোতে মিলিয়ে যায়। তবে কিছুদিন ধেয়ান সেনাপতির বংসধরেরা শাসন করেছেন খাসপুর ও নিকটবর্তী অঞ্চল।[২১]

ত্রিপুরা রাজ্য ও কোচ রাজ্যের চেয়ে কাছাড়ি রাজ্য ঐতিহাসিক দলিল ও তথ্যে ভরপুর। কেন না মাইবং থেকে রাজ্য স্থানান্তর করে কাছাড়ে রাজধানী স্থাপন করার পর রাজ্য অনেক দিন টিকেছিল। রাজা সুরদর্প থেকে শুরু করে গোবিন্দচন্দ্র বর্মণ পর্যন্ত সাহিত্যিক তথ্য এই কথা প্রমাণ দেয়।[২২]

এবং কাছাড়ি রাজাদের আমলে সমতল কাছাড়ে জনবিন্যাস আরও বিস্তৃতি লাভ করে। বাঙালি ব্রাহ্মণ মন্দিরে স্নান পেয়েছেন পুরোহিত হিসেবে তার সঙ্গে বাঙালিরাও বসতি স্থাপন করেছে সহজে।[২৩] বিশেষ করে বাংলা গদ্যের প্রয়োগ ব্যবহার হয়েছে রাজকার্য থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রে। আরও একটা কথা মনে রাখা উচিত অই একই সময়ে মাইবং, মণিপুরি, কাছাড়ি একদিকে আর অন্যদিকে বাঙালির (হিন্দু, মুসলিম) সঙ্গে মেলবন্ধনে কাছাড়ে এক নতুন জনবিন্যাস গড়ে ওঠেছিল যা আজও সমানে চলছে।

কিন্তু কাছাড়ি রাজত্ব পতনের প্রধান তিনটি[২৪] কারণ হল—

১। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বর্মণ ধার্মিক, ভীরু, অনভিজ্ঞ ছিলেন রাজ্য পরিচালনায়। বারবার তীর্থ যাত্রার ফলে রাজধনের ক্ষয় হয়েছে অনেক। ফলে রাজ্য দুর্বল হয়েছে আরও দ্রুত।

২। রাজা গোবিন্দচন্দ্র বর্মণ বিলাসী ছিলেন। এবং ভাই কৃষ্ণচন্দ্রের বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করে প্রধান মহিষী রূপে ঘোষণা করেন। ফলে রাজ্য পরিচালক ও প্রজাগণের মনে তাঁর প্রতি বিতৃষ্ণা আসে।

৩। মণিপুরের রাজার কন্যা ইন্দুপ্রভাকে বিয়ে করেন কৃষ্ণচন্দ্র এবং কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর গোবিন্দচন্দ্র। ফলে

মণিপুর রাজ্যের ঘনিষ্ঠতার বিনাশ কাছাড়ি রাজ্য পতনের অন্যতম একটা বড় কারণ।

বরাক উপত্যকার ইতিহাস কখনও সম্পূর্ণ হয় না সিদ্ধেশ্বর ও কপিলাশ্রম আর ভুবনেশ্বরের কথা আলোচনা ব্যতিত। কারণ এই স্থান বরাক উপত্যকার প্রাচীনত্ব ধরে রেখেছে নিজের শরীরে। এই প্রসিদ্ধ স্থান দুটির পরিচয় ও আলোচনার আগে বরাকের প্রাচীনত্বের কথা একবার স্মরণ করা যাক্ যে প্রাচীন পুরাণ কী প্রমাণ দিচ্ছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রভৃতি ভাষাবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন 'বরাক' শব্দটি 'বরবক্র' থেকেই এসেছে। 'বরবক্র' শব্দটি ত্রিপুরী ভাষায় 'বরক' রূপে পাওয়া যায়।[২৫] যার অর্থ মানুষ। ভিন্ন মত আছে তবে বেশির ভাগ চিন্তাবিদ তা সমর্থন করেন। আবার 'বরাহ পুরাণে' 'বরবক্র তীর্থ' বলা হয়েছে। এই মন্তব্যকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য 'কাছাড়ের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করা যায়—

বরবক্র তীর্থ—

''বরবক্র বা বরাক নদী যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই পুণ্যতোয়া বলিয়া বিখ্যাত তাহার প্রমাণ স্বরূপ বরাহ পুরাণ হইতে বরবক্র মাহাত্ম বিষয়ক শ্লোকগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

অথ বরবক্র মাহাত্ম্যং—

পূর্ব্ব তীর্থস্য মাহাত্ম্যংশৃণু পাণ্ডবপূর্ব্বজ।
সমাসেন মহাবাহ্যে গদতো মম সুব্রত।।
বহূনি সন্তি তীর্থানি সরিতাং প্রবরাণি চ।
ভৌমানিচ সুপুন্যানি সর্ব্ব পাপ হরাণি চ।।
বিন্দ পাদ গিরির্যত্র সাক্ষাদ্রূপেশ্বরো হরঃ।
যং দৃষ্ট্বা বিধিবৎস্নাত্বা শিবং সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ।।
যজ্জলে মনুজব্যাঘ্র মনুষ্যো মৃত এবহি।
তৎক্ষণাদেব স স্বর্গং যাতি সুর্য্যাপথেন চ।।
প্রাচ্য দেশে মৃতো জন্তুর্নরকং প্রতিপদ্যতে।
যাবদ্বর্ষসহস্রাণি যজ্জলেত্বমৃতো ভবেৎ।।
বিন্দপাদ সমুদ্ভুতা যাশ্চান্যাঃ সরিতাং বরাঃ।
তাস্তু পুণ্যতমা লোকে স্বর্গমুক্তি ফলপ্রদাঃ।।
যস্যৈবং নদরাজস্য বক্রে বক্রে চ পুণ্যদং।
তীর্থং প্রশস্তং বিখ্যাতং বরবক্রং ততঃ স্মৃতম্।।
রূপেশ্বরস্য দিগ্‌ভাগে দক্ষিণে মুনি-সত্তমঃ।
বরবক্র ইতি খ্যাতঃ সর্ব্বপাপ প্রণাশনঃ।।
যত্র তেপে তপঃ পূর্ব্বং সুমহৎ কপিলো মুনিঃ।
যত্র কাপালিকং তীর্থং শুভং সিদ্ধেশ্বরো হরঃ।।
যত্র স্নাত্বা নরো যাতি বিষ্ণুলোক মনুত্তমং।
উপাসতে মহাত্মানো যত্র সিদ্ধাশ্চতুর্দ্দশ।।
যস্য পশ্চিমকোণেতু কুণ্ডং তপ্তোদকং স্মৃতম্।
সর্ব্বপাপহরং সাক্ষদগ্নিতীর্থ মনুত্তমম্।।

প্রণাম স্তোত্র—

ওঁ বিন্দপাদ সমুদ্ভুত বরবক্র মহানদ।
নমস্তে পুণ্যফলদ সর্ব্বপাপপ্রমোচন।।
ইতি স্তুত্বা প্রণমেৎ।।

ইতি বায়ুপুরাণে।

বরবক্র মাহাত্ম্যং।

অর্ঘ মন্ত্র—

বরবক্র মহাভাগ সর্ব্বতীর্থ-ফলপ্রদ।
গৃহাণার্ঘো ময়াদত্তঃ ভক্তিমুক্তিপ্রদোভব।।
ইতানেনৈব মন্ত্রেণ যো দদ্যাদর্ঘমুত্তমং লক্ষ্মী মাপ্নোতি
স সুখী পুত্রপৌত্রযুতো ভবেৎ।

অনুবাদ—

হে পাণ্ডবাগ্রজ। পূর্ব্ব তীর্থের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। হে মহাবাহো, হে সুব্রত, আমি তোমার নিকট ইহা সংক্ষেপে বলিতেছি।

এখানে সুপবিত্র সর্ব্বপাপহর অনেক তীর্থ ও জলাশয় আছে, যেখানে বিন্দপাদ গিরি এবং সাক্ষাৎ রূপেশ্বর হর বিরাজমান, যাহাকে বিধিবৎ স্নান করিয়া দর্শন করিলে শিব-সাযুজ্য লাভ হয়। হে নরব্যাঘ্র। তাহার জলে মনুষ্য মরিলে তৎক্ষণাৎই সূর্য্যপথে স্বর্গে গমন করে। জীব প্রাচ্যদেশে মরিলে সহস্রবর্ষ নরক ভোগ করে, কিন্তু তাহার জলে মরিলে লোক অমর হয় এবং অন্যান্য যে সকল নদী বিন্দপাদ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে তাঁহারা ইহলোকে অতিশয় পবিত্র এবং স্বর্গ ও মুক্তিফল প্রদায়িনী। সেই নদরাজের বাঁকে বাঁকে পুণ্যপ্রদ প্রশস্ত বিখ্যাত বরবক্র নামে স্মৃত তীর্থ আছে। রূপেশ্বরের দক্ষিণ দিকে বরবক্র নামে খ্যাত সর্ব্বপাপ-নাশন একটি তীর্থ আছে, যেখানে পূর্বকালে মুনিশ্রেষ্ঠ কপিল মহাতপস্যা করিয়াছিলেন, যেখানে শুভপ্রদ কপিল তীর্থ এবং সিদ্ধেশ্বর হর বিরাজ করেন, যে তীর্থে স্নান করিলে লোক উৎকৃষ্ট বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়, যেখানে মহাত্মা চতুর্দ্দশ সিদ্ধ পুরুষ উপাসনা করিয়াছিলেন এবং যাহার পশ্চিম কোণে তপ্তোদক কুণ্ড আছে। উহা সর্ব্বপাপ হরণ করে এবং অত্যুৎকৃষ্ট অগ্নিতীর্থ।"[২৬]

উপরের এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় যে বর্তমান 'বরাক'-ই বরবক্র থেকে এসেছে। বরবক্র ছিল পূণতীর্থ এবং প্রাচীন কাল থেকেই তার মাহাত্ম্য সুগভীর, ঐতিহ্যশীল ও পরম্পরাগত। অনুবাদ বাক্য থেকে তার অনুমান পাওয়া যায়।

ত্রিপুরার উনকোটি তীর্থস্থানের মতই ভুবনেশ্বর ও সিদ্ধেশ্বর কপিলাশ্রম তীর্থের মাহাত্ম্য ইতিহাসে, পুরাণে জনমানসে বিখ্যাত ও সুবিদিত। এখানে এই দুটি তীর্থের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে পরিচয় হওয়া যাক্।

সিদ্ধেশ্বর কপিলাশ্রম ঃ— সিদ্ধের অতি পূণ্যভূমি। এই ভূমি বদরপুর স্টেশন থেকে কিছু দূরে পূর্ব দিকে বরাক নদীর তীরে অবস্থিত। জনশ্রুতি আছে প্রাচীনকালে নিকটবর্তী টিলায় শিবলিঙ্গ মূর্তি ও কপিল মুণির আশ্রম ছিল। মুণি এই শিবলিঙ্গের পূজা করে সিদ্ধি লাভ করেন। সে জন্য এই ঘটনায় উক্ত শিবলিঙ্গ মূর্তি সিদ্ধেশ্বর নামে বিখ্যাত হয়ে যায়। কিন্তু বরাক নদীর পার ভাঙনে নদীগর্ভে বিলীন হতে যাচ্ছে তা। এই মূর্তির পাশে নাকি একটা পরশপাথরও ছিল। তা নিয়ে অতিলৌকিক ও কাল্পনিক কাহিনি প্রচলিত আছে জনমানসে।[২৭]

ভুবনেশ্বর মন্দির— কাছাড় জেলার দক্ষিণ-পূর্ব সীমায় লুসাই পাহাড় থেকে বরাক নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত আছে ভুবন পাহাড়। এই ভুবন পাহাড়ের মধ্যে আছে 'ভুবনতীর্থ'। পাহাড়টির উচ্চতা প্রায় তিন হাজার ফিট। পাহাড়টির নিচে একটি কুকি জনজাতির পুঞ্জি আছে। এই পুঞ্জি থেকে প্রায় তিন মাইল উপরে 'মোকামটিলা' নামে পরিচিত একটা অঞ্চল। এখান থেকেই দুটি রাস্তা শুরু হয়েছে ভুবনেশ্বর মন্দিরের দিকে ও দ্বিতীয়টি বিস্ময়কর হ্রদের দিকে।[২৮]

এখানে একবার ভুবনেশ্বর মাহাত্ম্য স্মরণ কর যাক—

"কলি বক্রে স্থিতং দেবং গুপ্তাখ্যাং ভূবনেশ্বরম্।
ত্বং প্রণম্য নরো ভক্ত্যা প্রাপ্নুয়াদীস্বরপদম্।।"

— যোগিনী তন্ত্রে।[২৯]

মহা গৌরীতু যা দেবী যোগিনী সিদ্ধরূপিনী।।
সা ব্রহ্মপর্ব্বতে চাস্তে শিলারূপেণ চোর্দ্ধতঃ।
অতীবরূপসম্পন্না নাম্না সা সুরেশ্বরী।।"

— ভুবনেশ্বরী কথনং। কালিকা পুরাণে।[৩০]

ভুবনেশ্বর মন্দির প্রাচীনকালে পাথর নির্মিত ছিল। এবং এখনও মুণ্ডহীন অর্ধমূর্তি আছে কয়টা। পাথরে খোদাই করা অনেক চিত্র আছে। সে কবে কারা এই অমর কর্ম করে চলে গেছেন। তারপর বহুদিন কালের অন্ধকারে জনহীনভাবে লুকানো ছিল তা। ১৭০৯ শকাব্দের আগে এই পবিত্র তীর্থ সম্পর্কে মানুষ জানত না। অই সালে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সচিব জয় সিংহ ভুবনেশ্বর নির্মিত মন্দির নির্মাণ মানসে অনেক মানুষসহ ভুবন যাত্রা করেন। শ্রুতি আছে স্বপ্নাদেশে জেনে ভুবনের উদ্দেশ্যে সোনাইমুখের কাছে চন্দ্রগিরিতে (চাঁদের টিলা বা চাঙ্গুটিলায়) শিবলিঙ্গ স্থাপনপূর্বক একটি ছোট মন্দির নির্মাণ করালেন। এই মন্দিরের কাছে দুটি প্রস্তরফলকের অনুলিপি দেয়া হল—

পূর্ব দেয়ালের ফলক—

> ''শ্রীশ্রীভুবনেশ্বর শিব প্রীতিকাম তস্মিন্ হেতোঃ শ্রীশ্রীযুক্ত হেড়ম্বেশ্বরস্যাধিকারে স্বর্ণপুরনগর মধ্য চন্দ্রগিরি শ্রীশ্রীমন্মহারাজ পাত্র জয়সিংহ বর্ম্ম সুশীল বরণে মন্মদিষ্টকাদিচয়োর্ব্বিচিত্র নির্ম্মিতের প্রাসাদ পূর্ণমিতি।''[৩১]

দক্ষিণ দেয়ালের ফলক—

> ''স্বর্ণাখ্যপুর নগরে ভুবনেশ্বরস্য হেতোর্ব্বিচিত্র প্রাসাদিষ্টকচয়োপরি নির্ম্মিতেব। খেটাম্বর নগেন্দু শাকে ভানু স্থিতে মন্মথ রাশৌ পূর্ণমিতি। শ্রীমন্মাহারাজ পাত্রবরণে হেড়ম্বেশ্বরস্য সচিব শ্রীজয়সিংহ সুবুদ্ধিমান চন্দ্রাখাস্য চ গিরিশৃঙ্গে কৃতোহপিষ্টক শিব গৃহং।''[৩২]

উপরের এই দুটি প্রস্তর ফলকের প্রমাণ দেয় যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে মন্দিরের পুনির্মাণ হয়েছে। কিন্তু এর বহু প্রাচীন কালে তা নির্মাণ হয়েছে—হয়েছে শিবায়ণও। ভুবনেশ্বর তীর্থের আরও একটি বিস্ময়কর তথ্য হল ভুবন পাহাড়ের গর্ভে খোদিত সুড়ঙ্গ বা হ্রদ। এই সুড়ঙ্গ নিয়ে বিভিন্ন জনশ্রুতি আছে। এই সংকীর্ণ পথ দিয়ে চলে যেতে পারলে যাত্রীরা পুনর্জন্ম লাভ করে। অন্য মতে এই সুড়ঙ্গপথে সাধু সন্ন্যাসীরা ভাগ্যবান পুরুষেরা কামাখ্যায় পৌঁছাতে পারেন—ইত্যাদি।[৩৩]

কিন্তু একটা জিনিস যুক্তিবাদী চিন্তায় মনে হয় কোনও আদিম জাতি বা কোনও শক্তিশালী রাজা এই সুড়ঙ্গ নির্মাণ করেছেন বহিঃশত্রু আক্রমণ ও উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। যাতে তারা এই সুড়ঙ্গে লুকিয়ে প্রাণ বাঁচতে পারে। এই রকম পরিকল্পনার উদাহরণ উত্তরপূর্বাঞ্চলে যথেষ্ট পাওয়া যায়। তা না হলে আরও একটা কারণ হতে পারে। আমরা ইতিহাস থেকে জেনেছি যে আদিম জাতিরা পাহাড়ের গুহায় বাস করত। বংশ পরম্পরা ও ঐতিহ্যানুযায়ী এ রকম কোনও এক আদিম জাতি বসবাস করেছিল এই গুহার। গুহার আরও সংস্কার করেছিল দীর্ঘ ও গভীর করে উত্তরসূরিরা তাদের বংশ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। হয়ত বা সে জন্যই এত দীর্ঘ হয়েছে এই গুহা। ইতিহাসে এ রকম জাতি ও গুহায় বসবাস করার সাক্ষী দেয়।[৩৪] যা পরবর্তীকালে এই আদিম জাতির কোনও কারণে চলে যাওয়ায় বা ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় গুহাটাই রয়ে গেছে কালের যাত্রায়। আমাদের বিশ্বাস তা-ই বলে।

এখানে গবেষক অমলেন্দু ভট্টাচার্যের একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যাক্—

> ''পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ, অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, জগন্নাথ দেব, দেবব্রত দত্ত, সুজিৎ চৌধুরী, জয়ন্তভূষণ ভট্টাচার্য, কামালুদ্দীন আহমেদ প্রমুখ। এসব আলোচনার সারাৎসার অনুযায়ী সমতল কাছাড়ের ধারাবাহিক ঐতিহাসিক রূপরেখাটি এ-রকম ঃ খ্রি. পঞ্চম শতাব্দীতে সমতল কাছাড়ে ত্রিপুরী রাজ্য গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। অষ্টম-নবম শতাব্দীতে এ অঞ্চল ছিল হরিকেল রাজ্যের অন্তর্গত। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর ভাটেরা তাম্রলিপি অনুযায়ী সমতল কাছাড় তখন শ্রীহট্ট রাজ্যের অধীনে ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে শ্রীহট্ট রাজ্যের পতনের পরিপ্রেক্ষিতে সমতল কাছাড় ও সন্নিহিত অঞ্চলে গৌড়, লাউড়, জয়ন্তীয়া ইত্যাদি কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। ষোড়শ শতাব্দীতে কোচ সেনাপতি চিলারায় কাছাড়ে কোচ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যদিকে ১৫৩৬ খ্রিঃ. আহোমদের হাতে পরাজিত হয়ে ডিমাসা রাজারা ডিমাপুর থেকে মাইবঙে তাঁদের রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। কাছাড়ের শেষ কোচ রাজা অপুত্রক ভীম

সিংহের কন্যা কাঞ্চনীর সঙ্গে ডিমাসা রাজ পরিবারের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হলে ১৭৫০ খ্রিঃ রাজধানী মাইবঙ থেকে খাসপুরে স্থানান্তরিত হয়। ব্রহ্মদেশীয় আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে এই রাজবংশের শেষ রাজা গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ ১৮২৫ খ্রিঃ খাসপুর পরিত্যাগ করে হরিটিকর নামক স্থানে নূতন পাট (রাজবাড়ি) স্থাপন করেন। এখানেই ১৯৩০ খ্রিঃ তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন। ১৮৩২ খ্রিঃ ১৪ আগস্ট কাছাড় ইংরেজ অধিকারভুক্ত হয়।" [৩৫]

এই মন্তব্যটির মধ্যে এ অঞ্চলের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে সামগ্রিক একটা ধারণা পাওয়া যায়।

এই খন্ডের শেষে স্পষ্টভাবে বলা যায় ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও নৃতাত্ত্বিক যত সব প্রমাণ, দলিল, সংকেত, জনশ্রুতি ইত্যাদি এতটুকু প্রমাণ করে যে আজকের বরাক উপত্যকা সেই পূর্বসূরির উত্তরসূরি ও উত্তরাধিকার। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কালের যাত্রা পেরিয়ে এসে আজ বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। তবে আমরা ভবিষ্যতে আরও আশা প্রত্যাশা ও ভরসা রাখি বিভিন্ন ধরনের গবেষণা ও নৃতাত্তিক আবিষ্কারের দ্বারা এ অঞ্চলের ঐতিহাসিক রাজনৈতিক পটভূমির আরও বিভিন্ন দিক পরিষ্কার ও আবিষ্কার হবে অগ্রসর সূর্যালোকে।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি

আমরাও গভীরভাবে বিশ্বাস করি Land, Language, Labour এবং Lore এই চতুষ্টয় উপাদানের সংযোজনে সমাজ ও সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়।[৩৬] এই চতুষ্টয় একে অপরের পরিপূরক—সহযোগী সত্তাও। তাই সমাজ ও সংস্কৃতির অঞ্চল বিচার করতে হলে এই চতুষ্টয়ের সামগ্রিক দিককে বিশেষভাবে কাজে লাগাতে হয়—উপযুক্ত ওজন দাম মূল্য পরিমাপ সহকারে।

এই জায়গায় (প্রথমে) আরও একবার খুব সংক্ষেপে বরাক উপত্যকার সামগ্রিকভাবে বর্তমান পরিচয় মনে করা যাক্ ঐতিহাসিক ড. জয়ন্তভূষণ ভট্টাচার্যের ভাষায়—

> ''তিনদিক থেকে পাহাড় ঘেরা এই উপত্যকায় সমাজ পত্তনের আদিপর্বে ভারত-আর্য জনগোষ্ঠীর অবাধ সমাগমের ভৌগোলিক সংযোগ ছিল প্রতিবেশী মেঘনা উপত্যকার সঙ্গে। সেই সুবাদে এই উপত্যকার সামাজিক জীবন ছিল বঙ্গীয় সংস্কৃতির সঙ্গে একই সূত্রে বাঁধা। ত্রিপুরী রাজ্যগঠন প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পর্বের এই পটভূমি সপ্তম থেকে দশম শতাব্দীর বিভিন্ন সময়ে সমতট, কামরূপ ও হরিকেল রাজ্যর অন্তর্ভুক্ত ছিল। দশম শতাব্দীতে বঙ্গের অধিপতি মহারাজ শ্রীচন্দ্রে রাজত্বে পৌন্ড্রবর্ধন 'ভুক্তি' বা প্রদেশের অন্তর্গত শ্রীহট্ট মণ্ডলের চন্দ্রপুর, গরলা ও পোগার এই তিনটি 'বিষয়' বা জেলা অবিভক্ত এই উপত্যকায় অবস্থিত ছিল। একাদশ শতাব্দীতে সম্পূর্ণ এই অঞ্চল নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল সার্বভৌম শ্রীহট্টরাজ্য। এই রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছিল অবিভক্ত বরাক উপত্যকার সমাজ ব্যবস্থা, জীবনধারা ও লোক-সংস্কৃতির বুনিয়াদ।
>
> পরবর্তীকালে রাজনৈতিক ভাঙাগড়া এবং নানা জাতি, উপজাতি, ধার্মিক ও ভাষিক জনগোষ্ঠীর সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে সেই বুনিয়াদ আরও সুদৃঢ় হয়েছিল এবং বরাকের লোক-সংস্কৃতি এক সার্বজনীন ও সুসংবদ্ধ ধারায় বিকশিত হয়েছিল। মধ্যযুগে ভক্তি ও সুফিবাদের প্রবক্তা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও হজরত শাহজালাল এবং তাঁদের অনুগামী অগণিত আউল-বাউল ও পীর-ফকিরের উদার আদর্শে এখানকার জনমানস উদ্বুদ্ধ হয়েছিল এবং লোকসংস্কৃতিতেও শান্তি ও সৌহার্দ্যের বাতাবরণ গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। এই লৌকিক ঐতিহ্যের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে বরাকবাসীর প্রকৃত সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব।''[৩৭]

উপরের উদ্ধৃতি থেকে বরাক উপত্যকার একটা সামগ্রিক পরিচয়/ধারণা পেয়ে যাই। আর আমরাও বিশ্বাস করি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি পরিবর্তন বিবর্তন ইত্যাদির সঙ্গে রাজনৈতিক, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক সম্পর্ক

সুগভীর। এই মন্তব্যের প্রমাণ আমরা পেয়েছি এই পর্বের প্রথম দিকের আলোচনায়। এবং এই জায়গায় একটা কথা মনে রেখে এগিয়ে যাব আমরা যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমির সঙ্গে অনেক কিছু জড়িয়ে থাকে। অন্য রকমভাবে বললে বলা যায় সবকিছুই কোনো না কোনোভাবে জড়িয়ে আছে। কোথাও প্রত্যেক্ষভাবে আর কোথাও পরোক্ষভাবে—কোথাও একটু বেশি আবার কোথাও একটু কম।

আজকের বরাক উপত্যকার সমাজ ব্যবস্থা, সংস্কৃতি ব্যবস্থা, আচার বিচার, জীবনশৈলী ধারা, জীবনচর্চা চর্যা ইত্যাদি সুদূর অতীত থেকে চলে আসছে। এই জীবনযাপন বা ধারা শ্রীহট্টেরই। অর্থাৎ যে জীবনের ভিত সৃষ্টি হয়েছিল শ্রীহট্টে। তাই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপরেখা আলোচনায় সহযোগীসত্তা হিসেবে শ্রীহট্টেরও আলোচনা একান্ত প্রয়োজন। কারণ শ্রীহট্ট ভাগ (অন্য দেশের অখণ্ড টুকরো) হওয়ার উনসত্তর বছর হয়েছে—আর এ উপত্যকার সঙ্গে শ্রীহট্টের ঐতিহ্য, সম্পর্ক, পরম্পরা, ইত্যাদি হাজার বছরের পুরোনো।[৩৮]

এই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চর্চায় Sir Edward Gait-এর একটি মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য—

> "Although Sylhet may at times trave formed part of the ancient Kingdom of Kamrupa it was never during the historical period included in Assam as the term was understood prior to 1874."[3]

গেইটের এই মন্তব্যের সমর্থন করি আমরা, কেন না শ্রীহট্ট যদি আসামের অন্তর্ভুক্ত থাকত তবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন অন্যরকম হত নিশ্চয়ই। এখানকার বাঙালির সমাজ ও সাংস্কৃতিতে অসমিয়া ঐতিহ্য ও পরম্পরা আরও বেশি সংযোজন হত। এখানে আরও একটা কথা শ্রীহট্টের সঙ্গে বলা ভালো যে বরাক উপত্যকাও প্রাচীনকালে আসামের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তা না হলে সমাজ ও সংস্কৃতিতে এখানকার বাঙালির মধ্যে অনেক সংযোজন হত। মধ্যযুগেও শ্রীহট্ট কাছাড় (বরাক উপত্যকা) আসামের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তা না হলে আসামের মধ্যযুগীয় প্রধান দুই সমাজ সংস্কারক শংকরদেবের বৈষ্ণব ধর্ম ও মাধবদেবের নব-বৈষ্ণব ধর্মের জোয়ার এসে গ্রাম, প্রত্যন্ত অঞ্চলও ভেজাত। তা না হয়ে হয়েছে গৌড়ীয় ও নদীয়া যুগের বৈষ্ণব ভাব ভক্তি ও সুফিবাদী ভাব ভক্তি ইত্যাদির প্রচার বিস্তার। তাতে নিশ্চিত হওয়া যায় ১৮৭৪ সালের পূর্বে শ্রীহট্টের মত এ অঞ্চল বৃহৎ বঙ্গেরই অঙ্গ ছিল। এটা আরও প্রমাণিত করে এ অঞ্চলের সমাজব্যবস্থা সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি।

কিন্তু আরও একটা কথাও পাশাপাশি মানতে হবে যে ১৮৭৪ সালে আসামে অন্তর্ভুক্তির ফলে শ্রীহট্ট কাছাড়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদান প্রদানে অনেক কিছু সংযোজন হয়েছে দুইদিকে। এটা অস্বীকার করা যায় না যে দুই সমাজ ও সংস্কৃতি কিছুটা সমৃদ্ধ ও লাভবান হয়েছে। যদিও অন্যদিকে অনেক বেশি ক্ষতি হয়েছে শ্রীহট্ট কাছাড়বাসীর—যা অনির্বচনীয়। বৃহৎ বঙ্গের সঙ্গে যে ব্যবধান তৈরি করে দিয়েছিল এই বিভাজন তা আজও পূর্ণ হয়নি বরং সমানে চলছে।

বরাক উপত্যকার ইতিহাসে ১৮৩০ থেকে ১৮৩২ সাল পর্যন্ত একটা টালমাটাল সময়। যেখানে মধ্যযুগের অর্থাৎ রাজার আমল ফুরাচ্ছে এবং আধুনিক যুগের মেলবন্ধন হচ্ছে। ষড়যন্ত্র, রাজা গোবিন্দচন্দ্র হত্যা, বহিঃশত্রুদের আক্রমণ, বৃটিশদের এগিয়ে আসা ইত্যাদি। ১৮৩২ সালে ১৪ আগস্ট ইংরেজরা কাছাড় শাসনের ভার নিল। ১৮৩৩ সালে দুধপাতিল থেকে টমাস ফিসারের স্থায়ি দপ্তর শিলচরে নিয়ে আসা হল। এবং এখান থেকেই আধুনিকতার সূত্রপাত হয় বরাক উপত্যকায়।

বরাক উপত্যকার চারদিকে বনজঙ্গল আবাদ করে চা-বাগানের উন্নতির চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে কৃষিনির্ভর জীবনে একটা আঘাত লাগল। যেখান থেকে কৃষকরা শিল্পনির্ভর জীবনের সঙ্গে পরিচিত হলেন এবং চিন্তার জগতে ব্যাপক প্রভাব পড়ল। এই প্রভাবের পেছনে যা কাজ করেছিল তা হল অফিস আদালত ইত্যাদি স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাকুরিজীবী, মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্ম হয়। চারদিকে চা-বাগান গড়ে ওঠতে লাগল শ্রমিক মজুর কাজে লাগল এবং

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হতে শুরু হল। ১৮৭১ সালে ডাক বিভাগের দায়িত্ব নিয়ে বরাক উপত্যকায় আসেন দীনবন্ধু মিত্র। পরবর্তী সময়ে বরাক উপত্যকার ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে 'কমলে কামিনী' (১৮৭৩) নাকটটি রচনা করেন। ১৮৭৫ সালে শিলচরে নর্মাল স্কুল স্থাপিত হয়েছে। ১৮৭৬ সালে পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপিত হয়েছে। ১৮৮১ সালে শিলচর টাউন কমিটি গড়ে ওঠেছিল। ১৮৮৫ সালে প্রিন্টিং প্রেস আসে হরকিশোর গুপ্তের উদ্যোগে। ১৮৯৯ সালে রেল পরিসেবা চালু হয়।[৩৯]

কিন্তু একটা কথা স্বীকার করতেই হয় এই আধুনিকতার বিকাশ ও প্রসার হয়েছে কাছাড়ে শিক্ষার প্রসার ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই। সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পটভূমিতে এই শিক্ষার বিকাশ প্রসারটাই সবচেয়ে বেশি উর্বরতা যোগান দিয়েছিল। কাছাড়ের শেষ সুপারিনটেন্ডেন্ট শ্রীহট্টের ব্যাপটিষ্ট মিশন চার্চের পাদ্রী প্রাইস সাহেবকে শিলচরে এনে তাঁর সাহায্যে স্কুলের সূচনা করেন। বর্তমানে স্কুলটির নাম 'গভর্ণমেন্ট হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল'। এই স্কুলের প্রথম হেডমাস্টার নবকিশোর সেনকে শ্রীহট্ট থেকে প্রাইস সাহেব এনে দিয়েছিলেন। পরবর্তী হেডমাস্টার অভয়াচরণ ভট্টাচার্য বিশ বছর শিক্ষকতা করেছিলেন। কাছাড়, উত্তর কাছাড়, লুসাই পাহাড় (মিজোরাম) এবং মণিপুরের শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা, উনিশ শতকে আবর্তিত হয়েছে এই শিলচর গভর্ণমেন্ট স্কুলকে কেন্দ্র করেই। ১৮৮০ সালে নরসিং স্কুল স্থাপিত হয়। ১৯০৫ সালে শিলচরে প্রবেশিকা পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৯০১ সালে বড়খলা এমই স্কুল স্থাপিত হয় এবং পরে এটিই বড়খলা হাইস্কুলে উন্নত হয়। ১৯৩৫ সালে গুরুচরণ কলেজ স্থাপিত হয়। এভাবে বরাক উপত্যকায় শিক্ষার বিকাশ ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক চিন্তাধারারও বিকাশ ও প্রসার হয়েছে।[৪০]

এখানে আমরা একবার ইতিহাসের দিকে দেখি তবে বর্তমান বরাক উপত্যকা ও প্রাচীন বরাক উপত্যকার (শ্রীহট্ট কাছাড়ের) একটা তুলনামূলক ধারণা পাব এবং আমাদের মনে এই ধারণা আরও স্পষ্ট হবে। শ্রীহট্ট কাছাড়ে (বরাক উপত্যকায়) সাংস্কৃতিক ও সামাজিক দুই দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি তুলপাড় করে বৈপ্লবিক জোয়ার এসেছিল। হজরত শাহজালাল ও তাঁর তিনশত ষাট দরবেশের ধর্ম প্রচার ও প্রসারে শ্রীহট্টে কাছাড়ে কী পরিবর্তন এসেছিল ইতিহাস তার সাক্ষি দেয় বহুমুখী ও বহুবৈচিত্র্য, তথ্যে, ভাবে ভাষায়।[৪১] যেখানে শ্রীহট্ট কাছাড়ের গ্রামে গঞ্জে তার প্রভাব পড়েছিল তুমুলভাবে প্রায় তৃণমূল স্তরে। এখানে একটা কথা মনে রাখা উচিত যে সমাজ ও সংস্কৃতির ধারক বাহক এই নিম্নবর্ণ, নিম্নশ্রেণির মানুষ থেকে তৃণমূল স্তরে পরিবর্তন এসেছিল। বরাক উপত্যকার সংস্কৃতি ও সমাজ এত বৈচিত্র্যময় হওয়ার পিছে হজরত শাহজালাল ও তিনশত ষাট সাধকের বহু পরিশ্রম ও সাধনা করতে হয়েছে। তারা গ্রামে জঙ্গলে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দুঃখে কষ্টে বলিদানে আল্লাহর উপাসনা করে মানবধর্মের প্রচার ও প্রসার করেছিলেন। সে জন্য তারা আজও অমর হয়ে আছেন। তাদের অনেকের নামে শ্রীহট্ট কাছাড়ের বিভিন্ন জায়গা ও অঞ্চলের নামকরণ হয়েছে। যেমন, বদর উদ্দিন শাহের নামে বদরপুর করিমগঞ্জ, হজরত শাহজালালের নামে কালাইনের জালালপুর হয়েছে, হজরত বুন্দাশীলের নামে করিমগঞ্জের বদরপুরের উত্তরদিকে বরাক নদীর পারে একটা গ্রাম আছে বুন্দাশীল, হজরত সৈয়দ শাহেব নামে শিলচরে দক্ষিণদিকে একটি গ্রামের নাম সৈয়দপুর হয়েছে। এছাড়া ফকিরটিলা, ওমরপুর, মৌলভি বাজার, খাদিম পাড়া, দরগাকোণা ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চল ও জনপদের নামকরণ হয়েছে ঐ সব সিদ্ধি সাধকের নামে। আমরা কিন্তু নামে কথাটা না বলে ক্রিয়াকলাপেই বলব। কারণ তারা তো আজকের নোংরা রাজনৈতিক নেতার মতো নিজের নামের সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দেননি। তাদের মানবিক কাজকর্মের জন্য তাদের নামে বিভিন্ন অঞ্চলের নামকরণ হয়েছে বিভিন্নভাবে।

শ্রীহট্ট কাছাড়ে এই সব আলোকপ্রাপ্ত সাধকের মাধ্যমে প্রকাশ পায় নতুন সুফিতত্ত্ব এবং আধ্যাত্মিকতত্ত্ব। এই সুফিবাদ ও অধ্যাত্মিকতা প্রকাশ হয়েছে মারিফতি গান, জারিগান, গাজির গান, ফকিরি গান, মুর্শিদি গান, গজল, নাজিম গান, ইত্যাদি গানের মাধ্যমে তাঁদের জীবনদর্শন, ধারণ, যাপন ও মানবিকতার জয়গানও। এই সব গান মানুষের মনে কী

গভীর প্রভাব ফেলেছিল কল্পনার অতীত তা। যার রেশ আজও বিভিন্ন অঞ্চলে জীবিত আছে। আল্লাহর মহিমা, গৌরব, প্রশংসা, ঐশ্বর্য প্রকাশই ছিল এই সব গানের বিষয়বস্তু। আত্মাকে শুদ্ধ করার অন্যতম অবলম্বন ছিল। আজও গ্রামে গঞ্জে প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই সব গানের ধ্বনি, মধুর সুর শুনা যায় সমাজের সাধারণ মানুষের কাছে। যেখানে তারা নিজেকে খুঁজে পায়—তাদের আত্মা আশ্রয় পায় ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বে।

একটা কথা মনে রাখা উচিত সুফিবাদের মতই বাউল সকল জাতিভেদ, সম্প্রদায়ের উপরে ওঠে মানবতাবাদের কথাই বলে। এবং সুফিবাদ ও বাউলবাদের মধ্যে বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য ও প্রকাশ ভঙ্গিতে অনেক মিল আছে। হাসন রাজা, রাধারমণ, সীতালং শাহ, ইরফান আলী, আফজল, শেখ ভানু, শাহ আকরম, দুর্বীন শাহ প্রভৃতির গান শুনা যায় বরাক উপত্যকার গ্রামে গঞ্জে আজও। এই সুফিবাদীরা ও বাউলবাদীরা মানবতার জোয়ার বয়ে দিয়েছিলেন।

আরও একটা সুগভীর দিক ভুললে ভুল হবে, সেটা হল মধ্যযুগের দ্বিতীয় প্রাণপুরুষ শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণববাদ ও ভক্তিবাদের যে জোয়ার এসেছিল নদীয়া যুগে। আসলে শ্রীচৈতন্যের পূর্বপুরুষেরা ও শ্রীচৈতন্যের এই ভক্তিবাদ শ্রীহট্টীয় ছিল অনেকটা। শ্রীহট্ট থেকেই তাঁরা শেকড়, মূল নিয়েই গেছিলেন। সে জন্য শ্রীহট্ট কাছাড়বাসী এই ভক্তিবাদে ও বৈষ্ণববাদের রস আস্বাদন করে নিজেকে পরিতৃপ্ত করেছিলেন। এমন কী কাছাড়ের শেষ রাজা গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণও বহুলাংশে বৈষ্ণব ছিলেন।[৪২]

বৈষ্ণব গান ও ভক্তিগানের রসে বরাক উপত্যকাও স্নাত ছিল এক সময়। যদিও আজ কালের অন্ধকারে এই সব সাংস্কৃতিক সামাজিক ক্রিয়াকলাপ দুর্লভ। তবুও আজও গ্রামে, প্রত্যন্ত অঞ্চলে, শুনা যায় দেখা যায় ঝুম্ধামাইল নাচ, ওঝা নৃত্য, বৌ-নাচ, রাখালিয়া নাচ, ভুলাভুলির নাচ, কীর্তনের নাচ, চা-বাগানে ঝুমুর নাচ, কাঠি নাচ। এই সব নাচের মধ্যে বহুকালের পরম্পরা লুকিয়ে আছে। এক সময় মনের তাড়নায় সংসারের অভাব উপেক্ষা করেও এই লোকসংস্কৃতি, লোকনৃত্য ও নৃত্যকলাকে ধরে রেখেছিল সাধারণ মানুষ। শ্রীহট্ট কাছাড়ের (বরাক উপত্যকায়) এই সব সংস্কৃতি ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপের আলাদা একটা পরিচয় ছিল স্বগৌরবে। দুঃখের বিষয় যা অধুনা প্রায় লুপ্ত—হারিয়ে যাচ্ছে অবক্ষয়ী আধুনিকতার আগ্রাসনে।

একটা কথা স্পষ্টভাবে বলা যায় বরাক উপত্যকায় জনবিন্যাসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির রক্ত গ্রহণ ও সংযোজনের সমন্বয় রয়েছে। কারণ ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতি মেলবন্ধনে গ্রহণে সংযোজনে এখানকার জনবিন্যাস গড়ে ওঠেছে। বৈচিত্র্যময় বরাক উপত্যকার বিভিন্ন চা-বাগান, গ্রাম, নগর, মফস্বল, প্রত্যন্ত অঞ্চল পরিদর্শন করে তাদের বিশ্বাস, পূজাপার্বণ, ভক্তি উপাসনা ও বেঁচে থাকার শৈলী বিশ্লেষণে দেখা যায় যে তা বহু পরম্পরাগত। এ অঞ্চলের আধুনিকতা এখানেই সবচেয়ে বেশি আঘাত পায় —উজ্জ্বল হয়। সে যাই হোক তাদের ভাষা, সমাজ, সংস্কৃতি অঞ্চলভেদে অনেকটা ভিন্ন। এখান থেকে বোঝা যায় যে বরাক উপত্যকার জনবিন্যাস বিভিন্ন জাতির মেলবন্ধনে ও সমন্বয়ে গড়ে ওঠেছে। সে জন্যই এখানকার সমাজ, সংস্কৃতি, ভাষা, পরম্পরা ইত্যাদি বহু বৈচিত্র্যময়। আমরা বিশ্বাস করি এই পরম্পরা শ্রীহট্ট যেদিন স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল তার পূর্বে শুরু হয়েছে—জনবিন্যাস, সমাজ, সংস্কৃতি ইত্যাদি।

এখানে বরাক উপত্যকার জনবিন্যাসের কথা একবার স্মরণ করা যাক। শ্রীহট্ট কাছাড়ের ইতিহাস প্রমাণ করে এ অঞ্চলে প্রথমে ত্রিপুরীরা, তারপর কোচরা, তারপর কাছাড়ীরা এবং সবশেষে মণিপুরিরা রাজ্য প্রসার বিস্তার করেছিলেন। এটা ছিল প্রাচীন থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত জনবিন্যাসের রূপরেখা।[৪৩] এবং তারপর থেকেই (অর্থাৎ ১৮৩২ সাল) ইংরেজদের আগমনে তার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিকীকরণে এ অঞ্চলের মানুষের জীবনশৈলী, জীবনচর্চা ও চর্যা, চিন্তাচেতনা, বিশ্বাস, সমাজ, সংস্কৃতি ও বেঁচে থাকার উপর যে প্রভাব পড়ল তা এক 'বিবর্তনশীল পরিবর্তন'। আগে বলেছি ত্রিপুরী থেকে মণিপুরি সবাই শুধু রাজ্যবিস্তার করেননি তাদের সমাজ, সংস্কৃতি, বেঁচে থাকার শৈলীও নিয়ে এসেছিলেন। তাই এই

সংযোজনে এখানকার জনবিন্যাসে এক নয়া মাত্রা যোগ হল। এবং এ অঞ্চলের মানুষেরা আরও সমৃদ্ধ হলেন।

কিন্তু ইংরেজদের কাছাড় শাসনের দ্বারা আধুনিক চিন্তার বিস্তার হতে শুরু হল। রাজ-আমল পর্যন্ত ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় জীবনর্চা, চর্যা, অনুশীলন। আর ইংরেজদের আগমনে এ অঞ্চলের আধুনিকীরণ শুরু হল। এই আধুনিকীকরণ ক্রমে কেন্দ্র থেকে প্রান্ত ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছাতে লাগল। এবং ক্রমে আলো আসতে শুরু করল অন্ধকার দূর করে। ইংরেজরা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, সমাজ, আচার বিচার নিয়ে এসেছিলেন। যদিও তাদের কাজ ও সংকল্প ছিল Rule & Divide তারপরও আমরা শিল্পে, সাহিত্যে, কৃষিতে অনেক উন্নতি করতে পারলাম। আরও বেশি পারতাম যদি ফ্রান্সের Northman- এর মতো[4] ইংরেজরা রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভাষিক ইত্যাদি দিকও বিস্তার করতেন। তবুও আমরা এই Rule & Divide থেকে অনেক কিছু পেয়েছি। যা আমাদের এ অঞ্চলের জনবিন্যাসে সুগভীর প্রভাব ফেলেছিল। নিচে তা সূত্রানুসারে উল্লেখ করতে পারি—

১। ঔদ্যোগিক, প্রযুক্তিক, যান্ত্রিক বিকাশ ও বিস্তার।

২। রাস্তাঘাট নির্মাণ, যোগাযোগ ও পরিসেবা ব্যবস্থার উন্নতি।

৪। শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য কোর্টকাছারি ও বিভিন্ন ধরনের বিল্ডিং নির্মাণ ইত্যাদি।

বরাক উপত্যকার বিশ শতকের আধুনিকতায় এই উপাদানগুলি দিগন্ত খুলে দেয়। এখানে এ অঞ্চলের জনবিন্যাসের কথা আরও একবার স্মরণ করা যাক্ সমালোচকের ভাষায়—

''কাছাড়ের তথা বরাক উপত্যকার জনবিন্যাসের বিচারে ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক সূত্র ছাড়াও আরো কতকগুলো বিষয়ে আলোকপাত করা উচিত। এ অঞ্চলের বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য তাদের জীবন-চর্যার মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়। তাদের আচার ব্যবহার ক্রিয়াকর্ম পদ্ধতি তাতে উপকরণ যোগায়। বরাক উপত্যকার পথে পথে নরগোষ্ঠীর চলাচলের এসব চিহ্নগুলি বিচার করে দেখলে তাদের আগমনের ও বসতি স্থাপনের আনুমানিক কাল সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায়। এ উপত্যকার ভাষাভাষীরা ভাষায় নবীন আর্যের এবং সংস্কৃতিতে বাঙালির ধারা অনুসরণ করে আসছে। এরা আর্য নন, অনার্যও নন, এরা দুয়ের টানাপোড়েনে গঠিত এক মিশ্র জাতি। বঙ্গভাষাভাষী হিন্দু মুসলমান সবার পক্ষেই একথা প্রযোজ্য। এ উপত্যকার আর্যসংস্কৃতিকরণ বাঙালির দান। হিন্দুরা একটি মিশ্রজাতি, অষ্ট্রিক বা কোলিড্, মেনালিড, অ্যালপাইন বা পূর্ব ব্রাকিডের মিশ্রণ। এদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে প্রচুর মঙ্গোলীয় রক্ত, ফলে বর্তমানে তপশীলী জাতি, জনজাতি বা অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। হিন্দু অভিভবে মগ্ন মঙ্গোলয়েড জাতির মধ্যে শিবের প্রভাব আছে। সপ্তম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যেই এই শৈব ভাবটি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। পট্টিকেরা রাজবংশের মূল মঙ্গোলয়েড নবধারা, তাঁদের মুদ্রায় বৃষ ও ত্রিশূল চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে। কাছাড়ে শিব এসেছেন এই সময় বা আরও কিছু আগে। কপিলাশ্রমে সিদ্ধেশ্বর শিব ও ভুবনতীর্থে শিবের প্রতিষ্ঠার পেছনে মঙ্গোলয়েড স্মৃতি বিজড়িত। কাছাড়ের যত্র তত্র শিববাড়ি পরিলক্ষিত হয়। তবে মঙ্গোলয়েড জাতির আগমনের পূর্বেও এখানে কিছু কিছু অষ্ট্রিক নরগোষ্ঠীর মানুষ বাস করত। এই অষ্ট্রিক চেতনাসম্ভূত সংস্কৃতিই ত্রিপুরার উনকোটিতে ও কাছাড়ের ভুবন পাহাড়ে রয়েছে। দেহহীন মস্তকের চিত্র ও মূর্তির মধ্যে দেবতার সন্ধানের আদিম প্রয়াস অষ্ট্রিক জাতির বৈশিষ্ট্য, কুণ্ডের মধ্যে উর্বরা শক্তির পূজা থেকে মাতৃতন্ত্র চেতনাও অষ্ট্রিক বোধ সঞ্জাত। ভুবনতীর্থে দুটিই বিদ্যমান।''[৪৪]

এই মন্তব্য থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট এখানকার জনবিন্যাস একদিনে বা এক যুগে গড়ে ওঠেনি। সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই তার শুরু হয়েছে। তবে তা সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে বাঙালিদের আগমনে। আর তা সম্ভব হয়েছে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের মাধ্যমে। সেজন্য এ অঞ্চলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ক্রমে বৃদ্ধি হয়েছে। আর এই বৈচিত্র্য ও মেলবন্ধন বরাক উপত্যকার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

এই খণ্ডের শেষে একটা কথা সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে শ্রীহট্ট বরাকের ইতিহাসে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কেবল

বিভাজন হয়েছে বারবার—বিভিন্ন রাজা ও রাজ্যের উত্তান পতন হয়েছে। কিন্তু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমন্বয়, মেলবন্ধন ও যোগসূত্র হয়েছে প্রতিবারই। সে জন্য এখানে নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা সমাজ, নানা সংস্কৃতি, নানা ধর্ম, নানা কর্ম ইত্যাদির মধ্যে মানবতার সংযোজন হয়েছে। আবার এই মানবতা জনমানসে দ্রুত স্থান দখল করে নিয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার উল্টোটা হয়েছে। আর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনে এ অঞ্চলের মানুষেরা প্রত্যেক জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই নিজস্ব সমাজ ও সংস্কৃতিকে আরও গতিময় ও সংস্কার করেছে এতে কোনও সন্দেহ নেই।

সাহিত্যিক পটভূমি

কাছাড়ের সাহিত্যিক পটভূমি খুঁজলে এর শেকড় অতিপ্রাচীন তা বহুবার প্রমাণিত হয়েছে।[৪৫] প্রথমেই মধ্যযুগের কথা আসে। মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল দেবদেবী অসুর দেবতা ইত্যাদি কাহিনির আড়ালে মানুষের জয়গান করা, এবং দ্বিতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্য রাজা জমিদার ইত্যাদি বিত্তবান মানুষের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য রচনা। কিন্তু কাছাড়ের মধ্যযুগের সাহিত্যের ধারাটা ঠিক এই দুই রকমের মধ্যে পড়ে না। কিছু সময়ের জন্য পড়ে বা এ রকম দু'চারজনের জন্য ভাবা যায়। কাছাড়ের রাজা মহারাজাদের (অনেকে) সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য থাকায় তাঁরা সংস্কৃত ভাষার ভাবগাম্ভীর্য মিশিয়ে বাংলায় সাহিত্য রচনা করে গেছেন।[৪৬] কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে আমাদের দলিলকে আরও একটু পাকা করে নেওয়া যাক। যেমন প্রথমে উল্লেখ করতে হয় কাছাড়ি রাজসভার শ্রেষ্ঠকীর্তি 'শ্রীনারদি রসামৃত' গ্রন্থের কথা। রাজা সুরদর্পের রাজত্বকালে মহারাণী চন্দ্রপ্রভার মহাদেশে কবি ভুবনেশ্বর বাচস্পতি গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন। এই গ্রন্থটি সংস্কৃত 'বৃহন্নারদীয় পুরাণ'-এর অনুবাদ। দুটি উদাহরণ দিয়ে দেখাতে চাই কবির রচনাকৌশল, শৈলী, কবিত্বের প্রকাশ। যেমন—

''হেড়ম্বাধিপতি তাম্রধ্বজের ঘরণী।
চন্দ্রপ্রভা দেবী সুরদর্পের জননী।।
পূণ্যবতী রাজমাতা দিলেন আরতি।
নারদিপুরাণ সার কহে বাচস্পতি।''[৪৭]

এবং দ্বিতীয় উদাহরণ—

''হেড়ম্বের মহারাজা সুরদর্প নাম।
প্রতাপে প্রচণ্ড অতি সর্ব্বগুণ ধাম।।
রাজার জননী চন্দ্রপ্রভা গুণবতী।
তনুরুচি চন্দ্রকান্তি সুশীলা সুমতি।।
কবি বাচস্পতি রাজমাতার আদেশে।
শ্রী নারদি রসামৃত রচিলা বিশেষে।।''[৪৮]

উপরের এই দুই উদাহরণ থেকে দুটা জিনিস সুস্পষ্ট যে কাছাড়ি রাজবংশধর সাহিত্যপ্রিয় ছিলেন। তা না-হলে কবি হৃদয় ভরে তাদেরকে প্রশংসায় আকাশে তুলতেন না। যদিও ইতিহাসবিদ ও নব্য ইতিহাসবিদেরা অনেকে পৃষ্ঠপোষক কবি লেখকে প্রশংসার টানে প্রশংসা ও অর্থ আদায়কারী মনে করেন। এবং দ্বিতীয় এই গ্রন্থখানি মহারাজ সুরদর্পের আমল ১৭০৮-১৭২০ সাল এই সময়ের মধ্যেই রচিত হয়েছে।[৪৯]

কাছাড়ি রাজবংশ সাহিত্যপ্রেমী ছিলেন তার উজ্জ্বল উদাহরণ ও ইতিহাস হল পরবর্তী কাছাড়ি আমলে রচিত সাহিত্য । এই জায়গায় উপরের কথাগুলি প্রমাণের জন্য মণিচরণ বর্মণ প্রণীত ও প্রকাশিত 'হৈড়ম্ব ভাষা প্রবেশ'[৫০] গ্রন্থ থেকে রাজসভা আমলের ছয়টি গানের উল্লেখ করব। যেমন—

(রাজা রামচন্দ্রধ্বজ নারায়ণ রচিত গান)

১নং গীত

রাগ ঃ মালসী
ত্রাণ কর গো জননী ! বিপদে পড়িয়াছি।। ধু।।
ভক্তি নাহি জানি মা গো ! শক্তি নাহি স্থির।
কেবল হইয়াছি আমি জগতে বাহির।।
সম্মুখে শমনের ভয় জ্বর জ্বর শরীর্ হয়,
হৃদয়ে ধরিয়াছি রাঙ্গাপদ শঙ্করীর।।
প্রণতি করিয়া বলে রামচন্দ্র নৃপ।
আনন্দে কৈলাসে যাব বলে দুর্গা শিব।।
(রাজা সুরদর্প নারায়ণ রচিত গান)
২নং গীত
রাগ ঃ মালসী
দীনদয়াময়ী নাম তোমার।। ধ্রু।।
শুনিয়া ভরসা বড় হইয়াছে আমার।।
পূজা, জপ, তপ কিছু নাহিক আমার।
তবে যদি কর কৃপা মহিমা তোমার।।
আমি ত কুমতি অতি গতি নাই আর।
ভরসা করিয়াছি কেবল শ্রীচরণ তোমার।।
প্রণতি করিয়া বলে সুরদর্প রায়।
আজ্ঞা কর মুণ্ড দিয়া ভজি রাঙ্গা পায়।।
(রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রচিত গান)
৩নং গীত
রাগ ঃ মালসী
কাহে শঙ্কটে ঠেলিলে মা ।। ধু।।
শরণাগত নত এ দীন দুর্গত মা।।
এ কোন মহিমা, —বল কি হবে শ্যামা,
বালক কান্দিয়া বেড়ায় যে মা।।
মা হইয়ে কুপিত ত্যজিলে নিজ সুত,
কে লবে কোলে তুলে সাধে গো।
ভকতি বিহীন, —কৃষ্ণচন্দ্র দীন,
নিবেদন করি রাঙ্গা পদে গো।।
(রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রচিত গান)
৪নং গীত
রাগ ঃ মালসী
জয়তি শ্রীচরণ চণ্ডীকাং ।। ধু।।
ব্রহ্মা হরিহর, সুরাসুরবর, সেব্যপদনখচন্দ্রিকাং।
ভবেশভামিনী, দুষ্কৃতি ঞ্জভনী, চপলানন জগদম্বিকাং।।
মন্দরবাসিনী, বিল্বনিকেতনী, জনন মরণ প্রতিপালিকাং।
নৃপকৃষ্ণচন্দ্রং তই ভবতন্ত্রং, কুরু কৃপাময়ী, ভবসাগর পারং।
সুখদং শুভদং, ঈপ্সিত জনদং, শ্রীপদ বঞ্ছিতপুরং।।
৫নং গীত
রাগ ঃ মালসী
জয় দুর্গে ! তব চরণ কমলে মিনতি প্রচুর ।। ধু।।
সুভালে সিন্দুর প্রতিবিন্দুকৃত তারকা বিজিত দ্যুতি।
সুনাসিকোপরি, দুলিত বেশর মদনমোহন ভাতি।।

হর্য্যক্ষবাহনী, কনকগৌরাঙ্গি, দ্যুমণি সুখুম আভা।
মদনমোহিনী, ধৃতসুভঙ্গিনী, কুণ্ডলে শ্রীগণ্ড শোভা।
মহাদ্যুতিযুত, সরত্ন মুকুট, বিচিত্র উত্তমাঙ্গি।
দিক্ বাহু শোভিনী, আয়ুধ যুতিনী, করিকুম্ভজিত স্তনি।।
সবক্ষ উপরে ছত্রিশ মালিনী সর্ব্বভূষা বিভূষিণী।
পঞ্চানন (সিংহ) কটি, সুগত্র ঘণ্টিনী অরুণাম্বর রাজিনী।।
চরণ পাবক নখনাক্ষত্রিক নূপুর পঞ্চম নাদিনী।।
বিশ্ব সৃজফুলে, অলি সরাজিত, শ্রীশ্রীচরণবৃন্দে।
যাম্যভয় দূর, চরণ প্রার্থিত দাস শ্রীগোবিন্দচন্দ্র।।
(ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ
হয়ার পর রাজা গোবিন্দচন্দ্রের রচিত গান)
৬নং গীত
রাগ ঃ ভাটিয়াল
হারে মন দিন গেল হরি বল না।। ধু।।
প্রাণ ভাই! ধর্ম্মরাজ অনুচরে, —বান্দিয়া নিবে তোমারে,
তাতে আছে অনেক যন্ত্রণা।
হস্তে গলে দিয়ে দড়ি মারিবে গদার বাড়ি,
তখনে রাখিবে কোন জনা
এ বন্ধু বান্ধব ভাই, —কারো সঙ্গে কেহ নাই,
এরে কিনা দেখ দুনয়নে।
সকলেই শমনের বশ, —রামনাম অমৃত রস,
সাক্ষী দিছে এ বেদ পুরাণে।
বসিয়া রহিলে কিনা সুখে —রামনাম বল না মুখে,
অন্তকালে কি বলিবে পাছে।
শমন পুছিলে বাত, —কি বোল বলিবে তাত,
তাহে তোমার বন্ধু কেবা আছে।।
গোবিন্দচন্দ্র পরাধীন, —এ রসে হইয়া হীন,
রামনাম মুখে নাইছে বোল।
হরি প্রেমের বানে —কেন না ডুবিলাম
ধিক্ মোর জনম বিফল।।

তারপর রাজসভা সাহিত্যে আরও একটা পালাবদলের পালা। (প্রায় শতবর্ষ) কয়েক দশকের মধ্যেই সাহিত্যের বহমান স্রোতে এসে নতুন সংযোজন হল। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বর্মণ (১৭৮০-১৮১৩) ছিলেন ধার্মিক ও নরম মনের মানুষ। সে জন্য তিনি সহজ ভাষায় দেবীর বন্দনা করে গেছেন। এই বন্দনা বা গানের মধ্যে ফুটে ওঠেছে দু'টি জিনিস একদিকে ধার্মিক ভাব অন্যদিকে রাজ্যের উন্নতির জন্য দেবির কাছে প্রার্থনা ও শক্তি কামনা। এই গান তিনটি[৫১] নিচে উল্লেখ করছি—

(১)

নাম তোমার রণচণ্ডী মাও রণের জান ছন্ধি।
রাখিয়াছ হেড়ম্বেশ্বর মাও করি নানা সন্ধি।
জন্মস্থান এড়ি আইলাম মাও তোমার নামটি শুনি।
স্থান মান দিয়া রাখ তোমার নামের ধ্বনি।।
মেড়া হংস মহিষ বলি মাও তাহে নাহি গণি।
আনন্দে মগন হইয়া দিমু নানা বলি।।
চৌদিকে অরণ্য মধ্যে মাও তোমার নামটি জাগে

কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজে তোমার চরণ মাগে।।

(২)

মাগো আর কতদিনে কমলপদ মাও দেখিমু নয়নে।
মনের মরম দুঃখে মাও ঝুরিয়া ঝুলিয়া মরি—
না দিলাম চরণে জবা মাও অঞ্জলি ভরি ভরি।। ধু।।
শিশুকালে মৈলা পিতা মাও রাজ্য নিলা পরে।
আমরা দুভাই অল্পমতি মাও ভাসাইলাম সায়রে।।
কৃষ্ণ মাণিক চান্দ বলে মাও তারা হইলা রাজা।
রঘুরামকে দেশে নেও মাও করিব তোমার পূজা।।

(৩)

মরে বলিয়া দেও মা কাতর সেবকের কি হইবে উপায়।
আমি ডাকি মাও মাও মাও মায়ে বাচ ভিন।
মায়ের কি দোষ দিমু আপনার কুদিন।।
মেড়া হংস মহিষ বলি মাও তাহে নাহি দায়।
তবে যদি কর দয়া ভজি রাঙ্গা পায়।।
আমি তোমার তুমি আমার মাও সর্ব্বলোকে জানে।
গলার পলিতা যেন না ছাড়ে ব্রাহ্মণে।।
চৌদিকে অরণ্যের মধ্যে মাও তোমার নামটি জাগে।
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজে তোমার চরণ মাগে।।

এই গানগুলির মধ্যে দেবী রণচণ্ডীর আরাধনা ও সহায় কামনা করা হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে একজন সাহিত্যিককেও পাচ্ছি আমরা। যিনি ধার্মিক কিন্তু ততটা পারিবারিক ও সামাজিক নন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ছোট ভাই গোবিন্দচন্দ্র রাজসভা সাহিত্যে একটা নয়া জিনিস সংযোজন করলেন তা হল কৃষ্ণায়ন। তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ ও প্রমাণ হল গোবিন্দচন্দ্র বিরচিত 'শ্রীমহারাসোৎসব গীতমালা' এই গীতমালা ভাগবতের দশম স্কন্দের ২৯ থেকে ৩৩ এই পাঁচটি অধ্যায়ের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। এখানে রাধাকৃষ্ণের রাসলীলা বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থে ভাগবতের ৭৬টি শ্লোক, কিছু বাঙ্গানুবাদ ও আরও ১৬টি শ্লোক আছে।[৫২] এখানে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি গোবিন্দচন্দ্র বৈষ্ণব কবিদের থেকে উপকৃত হয়েছিলেন। তা না হলে বৈষ্ণব কবিদের মত তিনিও ভণিতা ব্যবহার করতেন না। যদিও এটা মধ্যযুগীয় সাহিত্যের একটা পরম্পরা ছিল। তবে নিটোলভাবে প্রয়োগ আমাদের বিশ্বাসটা আরও প্রগাঢ় করে তুলে। আর গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ রচনার দ্বারা তিনি তা প্রমাণ করে দিয়েছেন। তাঁর একটা পদ উল্লেখ করছি—

''অপরূপ শারদ চন্দ্রিকা হেরি গৌর দ্বিজরাজে।
সঙ্গে রঙ্গে বিহরত ভকত সমাজ।। ধু।।
পুরুষ পড়িয়াছে মনে বিকল অন্তরে।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ধরণী উপরে।। ১।।
কোথা বৃন্দাবন কোথা নিকুঞ্জ কুটীর।
কোথা ব্রজাঙ্গনাগণ প্রিয় রাধা মোর।। ধু।।
ব্রজধাম রাসস্থলী স্মরিয়া কাতর।
বাক্য নাহি স্মরে প্রভু ভাবে ঝর ঝর।। ধু।।
শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণচন্দ্র লীলামৃত রসে।
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র নৃপ কবে জানি ভাসে।।''[৫৩]

কিন্তু অন্য একটা গানে নাটকীয়তা এবং মুক্ত নাচের আভাস পাওয়া যায়। যে নাচটা বিশেষভাবে রাসনৃত্যের পর্যায়ে পড়ে। এখানে গানটি উল্লেখ করছি—

''অঙ্গিমা ভঙ্গিমা কত না রঙ্গিমা

টমকি চমকি নাদ।
মৃদঙ্গ তাল গোপীর চাল
নাচেত নন্দলাল লাল।।
অঙ্গুলি তরাকি নাচয়ে চমকি
দেখায়ে মুচকি হাসিয়া।
বাজে ধৃমি, ধৃমি, নাগরকী নাগরকী
তাতা থৈয়া থৈয়া থৈয়া।।
সুমুদ্রা ঘণ্টিকা শ্রবণে শুচিকা
কঙ্কণ ঝঙ্কার নাদ।
নূপুর কিঙ্কিণী বলয়ের ঝনি
না না না না না বাদ্য।
শ্রবিত বচন বরণ ভূষণ
নর্তক গমন কামা।
রস রস সিন্ধুকত শত ইন্দু
শ্বেত বিন্দু বিন্দু রামা।।"[৫৪]

'শ্রীমহারাস্যোৎসব গীতমালা' গ্রন্থের গানগুলির মধ্যে প্রধানত তিনটা জিনিস পাওয়া যায়। যেমন—

(১) এই গীতমালার দ্বারা গোবিন্দচন্দ্রের বৈষ্ণবায়ন সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে।

(২) ভাগবতের সুললিত ভাষাকে সাবলীলভাবে অনুবাদ করেছেন। সংস্কৃত ভাষার উপর তাঁর পর্যাপ্ত দখল এখানে প্রমাণিত হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিক মনের পরিচয়ও।

(৩) এই গীতমালার দ্বারা বৈষ্ণব কবিদের উত্তরাধিকারও ধরে রেখেছেন। এবং বাংলা ভাষায় রসাল গান রচনা করেছেন। যে গানগুলির তালে ছন্দে রসে নাচের মাত্রা সমমান প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়া আরও অন্যান্য অনেক দিকের কথা উল্লেখ করা যায়।

গোবিন্দচন্দ্র রচিত 'গোবিন্দ কীর্ত্তন' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেন না রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে মণিপুরি রাজবংশের সম্পর্কে ও সখ্যতায় শাক্ত থেকে যে বৈষ্ণবায়ন হয়েছিল তা গোবিন্দচন্দ্রের সময়ে চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। তার প্রমাণ হল গোবিন্দচন্দ্র রচিত 'গোবিন্দ কীর্তন' ও 'শ্রীমহারাসোৎসব গীতমালা' গ্রন্থ দুটি।[৫৫]

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে কাছাড়ের জাতীয় কবি চন্দ্রমোহন বর্মণ বিভিন্ন ধরনের কবিতা রচনা করে গেছেন।[৫৬] কিন্তু সমালোচক বলছেন যে রাজসভা যুগের বিশিষ্ট কবি চন্দ্রমোহন বর্মণ রাজসভার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন না।[৫৭] আমরা যুক্তি দিয়ে দেখছি যে কবি চন্দ্রমোহন বর্মণের ক্ষেত্রে দুটি মন্তব্যই আংশিক সত্য। বর্তমান কাছাড় জিলার বিহাড়া অঞ্চলের গড়ের ভিতর গ্রামে তাঁর বসবাস ছিল। আরেক দিকে যদি রাজপৃষ্ঠপোষকতা না পেতেন তবে তিনি 'বাচস্পতি বিষয়ক কবিতা', 'কৃষ্ণচন্দ্রের কাশীযাত্রা', 'কাশীচন্দ্রের যুদ্ধ' ইত্যাদি ঐতিহাসিক তথ্য সমৃদ্ধ কবিতা কী রকম করে লিখতেন? আজকের মতো যোগাযোগ ব্যবস্থাটা অতটা উন্নত ছিল না যে গড়ের ভিতর গ্রাম থেকে রাজ পরিবারের এ রকম খবর রাখা। অর্থাৎ তিনি কোনও না কোনও ভাবে রাজসভা দ্বারা উপকৃত হয়েছেন।

এখানে কবি চন্দ্রমোহন বর্মণের তিনটি কবিতা[৫৮] আংশিক উল্লেখ করব। অনেক সমালোচক তাঁর কবিতা সমসাময়িক সময়ের সমান দাম দিতে চাননি। কিন্তু আমরা মনে করি তাঁর কবিতা সহজ সরল ভাষায় একজন বর্মণ বা কাছাড়িভাষি হয়েও এভাবে বাংলা ভাষায় সুন্দর করে লিখতে পেরেছেন এখানেই তাঁর সার্থকতা ও সফলতা। যেমন—

১) বাচস্পতি বিষয়ক কবিতা
এখানে হেড়ম্ব দেশে সুরদর্প রাজা।
"আশ্বিনে প্রতিমা গড়ি করে দুর্গাপুজা।।

সেইকালে রণচণ্ডী পূজে নৃপবর।
মেষ মহিষ বলি দেয় নিরন্তর।।
পূর্বপর কৌলিক রাজব্যবহার আছে।
অষ্টমীতে নরবলি দেয় দেবী কাছে।।
এই হেতু রাখে লোক নিযুক্ত করিয়া।
সামান্য প্রজাকে আনে তাহারা ধরিয়া।।
সেই সে সময় আসি হৈল উপস্থিত।
নরধৃত লোক সব বাহিরয় ত্বরিত।।
নর তল্লাসিয়া তারা বহুদূর যায়।
নর ধৃত করিবারে ছিদ্র নাহি পায়।।
পূজার সময় আর অল্পদিন আছে।
নরবলি না পাইলে রাজ্যে কার্যে পাছে।।
এই ভয়ে ধৃতকগণ চিন্তিত অন্তরে।
হেনকালে ব্রাহ্মণকে দেখিলেক দূরে।।
সবে যাইয়া বেড়িয়া ধরিল ব্রাহ্মণেরে।
মুখে বস্ত্র আচ্ছাদিয়া বান্ধিলেক পরে।।
হস্ত পদ আটিয়া বান্ধিল দৃঢ় করি।
নগুণ ফেলায় ছিঁড়ি দুষ্ট সবে ধরি।।
ধরিয়া লইয়া গেল দুষ্ট পাপিগণ।
নির্জন ঘরেতে রাখে করিয়া বন্ধন।।
মেল মণ্ডপের কাছে চণ্ডীমণ্ডপ ঘর।
তার সন্নিধানে আছে ছোট এক সর।।
সেই ঘরে বন্ধ করিয়া ব্রাহ্মণেরে।
প্রহরী সকলে রাখে সযতন করে।।
সুরদর্প মহারাজ মহাপুণ্যবান।
প্রতিদিন শুনে রাজা ভাগবত পুরাণ।।
পুরাণ গঠন করে গুরু মহাশয়।
পাত্র মিত্র সহ রাজা শ্রবণ করয়।।
একদিন বসি রাজা মেল মণ্ডপ ঘরে।
ভাগবত মহাপুরাণ গুরু পাঠ করে।।
ব্রাহ্মণ দুঃখিত অতি থাকিয়া বন্ধনে।
দু-নয়নে বহে নীর দুঃখ পাইয়া মনে।।
সংস্কৃত পড়িয়া শ্লোক ভাষিত করিতে।
শুদ্ধ কি অশুদ্ধ ভট্ট বিচারেন চিতে।।
যখন ধামাদি গুরু বিশুদ্ধ পাঠ করে।
হু হু শব্দ উচ্চারণ করে লঘু স্বরে।।
অশুদ্ধ হইলে পাঠ হা হা করি কয়।
এইরূপে বারম্বার শব্দ প্রকাশয়।।
শুনি সুরদর্প রাজা হইল বিস্ময়।
বল এই ঘরে কেবা প্রহরীরে কয়।।
আনহ ত্বরিতে তারে আমার নিকটে।
রাজ আজ্ঞা পাইয়া দূত আনে দ্রুতগতে।।
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল রাজন।
শীঘ্র করি করাইল বন্ধন মোচন।।

মুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণে নাহি কহে বাণী।
নগুণ নাহিক অঙ্গে দেখায় আপনি।।
প্রকার করিয়া হাতে সকল জানায়।
পূজিয়া ধামাদি গুরু নগুণ যোগায়।।
পবিত্র ধারণ করি অঙ্গে আপনার।
রাজগুরু ধামা দিয়ে করে নমস্কার।।
সুরদর্প মহারাজে আশীর্বাদ করে।
সেইকালে বাচস্পতি শ্লোক এক পড়ে।।"

এই কবিতার মাধ্যমে কাছাড়ি রাজামলের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য 'শ্রীনারদি রসামৃত' গ্রন্থের কবি ভুবনেশ্বর বাচস্পতি ভট্টাচার্যের অতীত কাহিনি ফুটে ওঠেছে যে তিনি কীভাবে সভা কবি হয়েছিলেন।

২) কৃষ্ণচন্দ্রের কাশীযাত্রা

''ভ্রাতা যুবরাজে আমি রাজ্য সমর্পিয়া।
কাশীযাত্রা করি আমি শ্রীদুর্গা স্মরিয়া।।
দুর্গারাম মন্ত্রী থাক ভ্রাতার সহিত।
এ রাজ্যের ভালমন্দ তোমাতে অর্পিত।।
এ বলিয়া মহারাজা শুভ তিথি চাইয়া।
শ্রীদুর্গা স্মরণে পদ দিল চালাইয়া।।
ভ্রাতার নিকট রাজা লইল বিদায়।
পূর্ব্বাপর রাজনীতি ভ্রাতারে শিখায়।।
দণ্ডবৎ করে পড়ি গোবিন্দচন্দ্র রায়।
আশীষ করিল তাহে রাজা মহাকায়।।
অন্তঃপুরে রাজরাণী সবে সম্ভাষিয়া।
বিদায় হইল রাজা সবে সম্বোধিয়া।।"

এই কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে যে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের হাতে রাজ্যভার সমঝে দিয়ে কৃষ্ণচন্দ্র বর্মণ কাশীযাত্রা করছেন। এখান থেকে কৃষ্ণচন্দ্রের ধার্মিকতা ও গৃহবিমুখতার পরিচয় পাওয়া যায়।

৩) কাশীচন্দ্রের যুদ্ধ

''হইল তুমুল যুদ্ধ কি কব উপমা।
রাম রাবণের যুদ্ধ নাহি হয় সীমা।।
উভয় দলেতে রণে, —দর্প করি ঘনে ঘনে
ছাড়ে গুল্লি শব্দ ছন্‌ছনি।
কামানের ধুড় ধুড়ী,— বন্দুকের হুড় হুড়ী
জাঠা জাঠি করে হানাহানি।।
কেহ লইয়া অসি ঢাল, —ঘুরে যেন যমকাল
কাটিয়া ফেলায় বহুজনে।
করি কেহ শেল হাতে, —হানিয়া পালায় মাথে
কেহ ক্রোধে খড়্গ লইয়া হানে।।
হানাহানি করি সৈন্য, —পড়িলেক অগণ্য
সমস্ত দিবস এইরূপে।
কাশীচন্দ্র মহামতি, —তার পুত্র সেনাপতি
তুলারাম দেখি ধায় কোপে।।
অসি ঢাল লইয়া হাতে, —বিক্রম করিল তাতে
মন্ত্রিবরের সৈন্য বিনাশিল।
তাহা দেখি মন্ত্রিবর, —ক্রোধান্বিত হইয়া পর

ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভিল।।
দোহে করে মহারণ —নাহি হয় নিবারণ
দোহে দোহা করয়ে প্রহার।।
এইরূপে রণ করে, —সহিতে না পারি পরে,
তুলারাম হইল কাতর।।
পলাইয়া যায় রণে, —ভঙ্গ দিয়া সৈন্যগণে,
রণে জয় (হৈল মন্ত্রিবর?)।।"

এই কবিতার মাধ্যমে কাশীচন্দ্রের যুদ্ধ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। যেখানে কাশীচন্দ্রের পুত্র তুলারাম প্রভৃতির একটা পরিচয়ও পাওয়া যাচ্ছে।

উল্লিখিত কবিতার (খণ্ডাংশ) ভাষা, ছন্দ, শৈলী যে রকমই হোক না কেন তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। আর তার চেয়ে বেশি আছে সাহিত্যিক গুরুত্ব।

এ অঞ্চলের রাজামলের যবনিকা পতন হয়েছে একদিকে এবং অন্যদিকে এ অঞ্চলের প্রথম আধুনিক কবি রামকুমার নন্দী মজুমদারের জন্ম হয়েছে ১৮৩১ সালে শ্রীহট্টের পাটলী গ্রামে। ১৮৩০ সাল এ অঞ্চলের রাজামলের যবনিকাপাত হয়েছে এবং ১৮৩২ সালে ইংরেজ আমলের সূচনা অর্থাৎ আধুনিকতার সূত্রপাত। এই মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণে কবি রামকুমার নন্দীর জন্ম হয়েছে। তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসরের বেশি শিলচরে কাটিয়েছেন। ১৯০২ সালে কবির মৃত্যু হয়। কিন্তু একাত্তর বৎসরের জীবনে অনেক কিছু রচনা করে গেছেন। তাঁর রচনাকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—

১। মধ্যযুগীয় সাহিত্য ঃ— যেমন—

ক) পাঁচালি—কলঙ্ক, ভঞ্জন, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর দ্বন্দ্ব, ১৩০৫ সালের বোধন।

খ) যাত্রাপালা—দাতাকর্ণ, নিমাই সন্ন্যাস, সীতার বনবাস, বিজয় বসন্ত, পদাঙ্ক-দূত, কংস বধ, ঊষার আগমন, মার্কণ্ডের চণ্ডি, রাসলীলা, দোলযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, ভগবতীর জন্ম এবং বিবাহ।

এইসব পাঁচালি ও যাত্রাপালার কথা বলতে গিয়ে প্রথমে বলতে হয় রামকুমার নন্দী কিন্তু এইসব রচনার দ্বারা সমাজে যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন। কারণ রামকুমার যে সময়ের লেখক ছিলেন তখন আধুনিক শিক্ষার মাত্র পথচলা শুরু হয়েছে। সে জন্য তিনি প্রথম জীবনে প্রাচীন রীতিতে মধ্যযুগীয় ধাচে পাঁচালি ও যাত্রাপালা লিখেছিলেন। সেই সময়ে ও সমাজে চাহিদা ছিল এই রকম সাহিত্যের।

কিন্তু আধুনিকতার প্রভাবে গভীর প্রভাবিত হন। সে জন্য জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় থেকেই নতুন উদ্যমের সঞ্চার হয়েছিল তাঁর মনে। এবং তার সঙ্গে এসে যুক্ত হল আধুনিক যুগের প্রথম/প্রধান পথিকৃৎ মধুসূদন দত্তর কাব্যের প্রভাব। যা পশ্চিমীয় কাব্য (Milton, Byron প্রভৃতির) থেকে অর্জন করেছিলেন। এবং সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপন্যাসে নিয়ে আসলেন সম্পূর্ণতা। যা তিনি পশ্চিমীর উপন্যাস (Walter Scott প্রভৃতির) থেকে অর্জন করেছিলেন। সে ক্ষেত্রে বলা যায় রামকুমার নন্দী পরোক্ষভাবে তা গ্রহণ করেছিলেন এবং কবি মধুসূদন দত্ত ও ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে প্রত্যক্ষভাবে লাভবান হয়েছিলেন।

কবি রামকুমার নন্দীর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য'। কাব্যটি ১৮৭২ সালে প্রকাশিত হয়। কবি মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের নায়িকাদের পত্রের উত্তর স্বরূপ কবি রামকুমার এই কাব্যটি লিখেছিলেন। মধুসূদন তাঁর কাব্যে উনিশ শতকের নারীদের নবজাগরণের জন্য এক রকম আগমনী গেয়েছেন। যেখানে কাহিনি নিয়েছেন পুরাণ ইতিহাস থেকে কিন্তু উনিশ শতকের নারী জাগরণের নববার্তা প্রকাশ করেছেন। একটা কথা মনে রাখা উচিত মধুসূদন পাশ্চাত্য পুরাণ ও কাব্য (Ovid প্রভৃতির) দ্বারা প্রভাবিত ও অভিজ্ঞ হয়েছিলেন। কিন্তু রামকুমার নন্দী—মধুসূদন দত্ত

ও ভারতীয় পুরাণ এই সম্বল নিয়ে কাব্যটি লিখেছিলেন।

১৮৬২ সালের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের প্রতি উত্তর 'বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য' লিখেছিলেন ১৮৭২ সালে অর্থাৎ এক দশক পরে। এখান থেকে একটা জিনিস সুস্পষ্ট যে বৃহৎবঙ্গের সঙ্গে সাহিত্যিক যোগাযোগ অনেক উন্নত ছিল। এই গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশ হয়েছিল 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় তৃতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় (শ্রাবণ ১২৮১ বঙ্গাব্দ)[৫৯] । রামকুমার 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের প্রতিউত্তর এভাবে সাজিয়েছেন নিজ কাব্যে—'সরস্বতী দেবী'র আরাধনা, 'কল্পনা' ও 'মাইকেল' শীর্ষক অংশ। তারপরই পাই কাব্যটির মূল এগারোটি সর্গ জ্ঞ— প্রথম সর্গ (শকুন্তলার প্রতি দুস্মন্ত), দ্বিতীয় সর্গ (তারার প্রতি সোম), তৃতীয় সর্গ (রুক্মিণী দেবীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণ), চতুর্থ সর্গ (কেকয়ীর প্রতি দশরথ), পঞ্চম সর্গ (সূপর্ণখার প্রতি লক্ষ্মণ), ষষ্ঠ সর্গ (দ্রৌপদীর প্রতি অর্জুন), সপ্তম সর্গ (ভানুমতীর প্রতি দুর্যধন), অষ্টম সর্গ (দুঃশলা দেবীর প্রতি জয়দ্রথ), নবম সর্গ (জাহ্নবীর প্রতি শান্তনু), দশম সর্গ (উর্বশীর প্রতি পুরুররা), একাদশ সর্গ (জনার প্রতি নীলধ্বজ)।[৬০]

এগারোটা সর্গের প্রতি-উত্তর দিতে গিয়ে 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের নায়িকদের মতো 'বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্যে'র নায়কেরা জ্বলে ওঠেনি রাগে, অভিমানে, হিংসায়, যন্ত্রণায় ইত্যাদিতে। তারা শান্ত শিষ্টভাবে কখন নরম ভাষায় উত্তর দিয়েছে আবার কখনও প্রত্যক্ষভাবে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছেন। যুগযন্ত্রণার দ্বারা ও উনিশ শতকের দাবিতে পুরুষেরা নারীকে ক্রমে শিক্ষায়, সমাজে, সংস্কৃতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন। তার একটা যুগমানসিকতা প্রকাশ পাচ্ছে এখানে।

রামকুমার নন্দীর দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ রচনা হল 'মালিনীর উপাখ্যান (১৮৯২)। এই উপাখ্যানটি উনিশ শতকের শেষ দশকে রচিত এবং আসামের প্রথম বাংলা কথা সাহিত্যিক রচনা এতে কোনও সন্দেহ নেই। আখ্যানকারের মৃত্যুর আটত্রিশ বছর পর ১৯৪০ সালে 'বিজয়িনী' পত্রিকায় তাঁর কিছু অংশ প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাকি অংশ প্রকাশের আলো দেখেনি। তারপর ১৮৯২ সালে রচিত উপখ্যানটি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হয়েছে একশ পাঁচ বছর পর ১৯৯৭ সালে। এই আখ্যানটিই এই অঞ্চলের উপন্যাস রচনার প্রথম প্রয়াস।

রামকুমার জীবন-চরিতকার [৬১] 'মালিনী উপাখ্যান' সম্পর্কে বলেছেন এ রকম—

১। বঙ্কিমচন্দ্রের এরূপ পক্ষপাতী হয়েছিলেন যে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় একটা উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়ে যান।

২। রামকুমার নন্দীর সকল গদ্য বা কথা সাহিত্যের মধ্যে এই উপাখ্যানটিই শ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থের ভাষায় বঙ্কিমের প্রভাব সুস্পষ্ট।

৩। রামকুমার নন্দী বঙ্কিমচন্দ্রের মতো উপন্যাসিক হয়ে সমাজের প্রতিষ্ঠা লাভের স্বপ্নও দেখেছিলেন।

কিন্তু একটা জিনিস রামকুমারের 'মালিনী উপাখ্যন'-এর কাহিনিতে যুগযন্ত্রণা, মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ও বিশ্লেষণ, উচ্চ মাপের কল্পনা, জীবনদর্শন, মানুষের অন্তর্গত জটিলতার টানাপোড়েন, সমাজ বাস্তবতা ইত্যাদি অনুপস্থিত। এ উপখ্যানে পটভূমি আছে, আছে চরিত্রও কিন্তু যুগমানসের সেই সব উপাদান অনুপস্থিত। এখানে উপন্যাসটি থেকে উদাহরণস্বরূপ কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যায়। উপাখ্যানটির শুরু হচ্ছে এভাবে—

> ''বঙ্গদেশের মধ্যে শিমূলতলা নামে একখানি পল্লিগ্রাম আছে, সেই গ্রামে দিগম্বর মিত্র বাস করিতেন, তিনি নানা বিদ্যার বিদ্বান এবং নানা গুণে গুণবান ছিলেন; পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়সে, হেমমালিনী নাম্নী দশবর্ষীয়া একটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাহাকে হেমমালিনী বলিয়া কেহই ডাকিত না, কেবল বিবাহকালে যখন সম্প্রদান করা হয়, তখন হেমমালিনী নাম শুনিয়াছিলাম, সকলেই তাহাকে মালিনী বলিয়া ডাকিত, এজন্য আমরাও মালিনী বলিব। মালিনী একপ্রকার রূপবতী ছিল—কিন্তু স্বভাব দোষে তাহাকে কেহই ভালবাসিত না, মালিনী শিশুকালে যখন পিতার ঘরে ছিল, তখন পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয়েরাও তাহাকে বড় স্নেহ করিত না। সে কথায় ২ কেবল রাগ করিত, মন্দ কথায় যেমন ভাল কথায়ও তেমন;প্রতিবেশীদিগের বালক বালিকার সহিত সর্বদাই কলহ করিত, তাহাদের খেলার পুতুল

এবং অন্য ২ সামগ্রী চুরি করিত; নাহয় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিত; যে দ্রব্য তাহার নিজের নয় এমন দ্রব্যের প্রতি আপনার সত্ত বর্ত্তাইবার জন্য সপথ করিত, না হয় বলপূর্বক লইয়া আসিত; মিথ্যা কথা কহিয়া সকলকেই বঞ্চনা করিত। তাহার মনে দয়ার লেশমাত্রও ছিল না, ক্ষুদ্র ২ জীব জন্তুকে ধরিয়া নানাপ্রকার কষ্ট দিয়া প্রাণে বধ করিত। গৃহকর্ম্ম শিক্ষা বিষয়ে জননী কোন কথা বলিলে মালিনী কিছুই শুনিত না। ক্রমে বয়সের সঙ্গে ২ স্বভাবের দোষও বাড়িতে লাগিল। পতিগৃহে আসিয়া কিছুদিন সেসব গোপন রাখিয়াছিল, ক্রমে প্রকাশ গেল। মালিনী এখন আর নববধূ নয় ধিরে ২ মুখ ফুটিল, সকল কথার উত্তর দিতে শিখিল।"[৬২]

এই উপাখ্যানে রামকুমার নারীশিক্ষার প্রচার ও পোষকতা করেছেন। সমাজে, পরিবারে নারীর ভূমিকা এবং মদ্যপানের নেতিবাচক দিক তাতে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। আর তা উপাখ্যানের প্রধান চরিত্র হেমামালিনী বা মালিনীর মাধ্যমেই করেছেন। লেখক বিভিন্ন প্রসঙ্গ এনেছেন বিদ্যাসাগর, সুবোধ, রাখা প্রভৃতি। আর মালিনীকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন সামাজিক ও প্রগতিশীল এক ব্যক্তিরূপে 'মালিনী উপাখ্যান'র কাহিনিতে প্রধানত তিনটি ভাগ[৬৩] দেখা যায়—

১। মালিনীর প্রথম মুখরা ও সরল সহজ পরিচয় দান।

২। শিক্ষাগ্রহণের প্রতি মালিনীর উৎসাহ, আগ্রহ, উৎকণ্ঠা।

৩। সুরাপান রোধ করার জন্য প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন।

এই তিনটি প্রধান বিভাগে বা কেন্দ্রবিন্দুতেই 'মালিনীর উপাখ্যান' এর কাহিনিটি বর্ণিত হয়েছে।

এ অঞ্চলে সাহিত্যালোচনায় রামকুমার নন্দীর পরই প্যারীচরণ দাসের নাম আসে। তাঁর বহুবৈচত্র্য জীবন সাহিত্যভাবনা নিয়ে অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে অনেক কথা লিখেছেন।[৬৪] ১৮৪৬ সালে বর্তমান করিমগঞ্জ জেলার লাতু গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। উচ্চশিক্ষার জন্য ১৮৬৭ সালে কলকাতা শহরে যাত্রা। প্রত্যাবর্তন করার পর ১৮৭৫ সালে 'শ্রীহট্ট প্রকাশ' পত্রিকা (সাপ্তাহিক) প্রকাশের পরই তাঁর রচনা প্রকাশ করতে শুরু করেন।

প্যারীচরণ দাসের কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—'মিত্রবিলাপ' (১৮৭০) তখন কলকাতাবাসী, 'পদ্যপুস্তক' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ (১৮৭৬), 'পদ্যপুস্তক' তৃতীয় ভাগ (১৮৭৭), 'ভারতেশ্বরী' (১৮৭৭) ইত্যাদি তিনিও বাংলার প্রথম আধুনিক কবি মধুসূদন দত্ত দ্বারা প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছিল। ১৮৬১ সালে প্রকাশিত 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য প্রকাশিত হয়েছে। আর ১৮৭২ সালের জুনে তিনি লিখেছেন 'নিকুঞ্জবিহার' কবিতাটি। এখানে তা উল্লেখ করছি—

নিকুঞ্জবিহার

(১)

''একদিন ব্রজকুঞ্জে রাধাবিনোদন
শ্রীমধুসূদন
'বিনোদ মন্দিরে' পশি, হেরিলেন কালশশী,
ব্রজের বিজলী জ্যোৎস্না রাধার বদন,
আঁধার ঘরের আলো, প্রিয় দরশন,
পূর্ণেন্দুমোহন।

২

সমধুর মুখভঙ্গী, মদন মাধুরী
সুন্দর শোভন,
হাসিত নয়ন নীল, লজ্জাবতী লজ্জাশীল,
তুমি আঁকা ভুরুভঙ্গ ভবে অতুলন,
পদ্মরাগ, কিশলয়, পরাণ-লাঞ্ছন
অধর লোভন।

৩

কুঞ্চিত অলকাবলি চুম্বিত কপোল
গোপাল-গঞ্জন,
ললিতাঙ্গি দ্রুমাধরে, হাসিখুসী নৃত্য করে,
কৌমুদীর বেণী যেন নধর সদন,
মৃদুল সঞ্চার, পূর্ণ শক্তি সম্মোহন
অপূর্ব দর্শন।

৪

ব্রজকুঞ্জ বন শোভা মধু বিম্বাধরা
রাধা বিনোদিনী
সুনীল আঁচল পাতি, তুলি ফুল নানা জাতি,
অধোমুখে বনমালা গাঁথেন মোহিনী
অর্পিতে গোবিন্দ গলে আইলে যামিনী
মালা সুশোভিনী।

৫

দেখিলা ব্রজের ইন্দু চির মনোহর
অবেণী বন্ধন—
ঘনকৃষ্ণ কেশভার, পৃষ্ঠ করি অন্ধকার,
চুম্বিতেছে এক মনে ধরার বদন
আদরে লইলা করে মদনমোহন
কুন্তল শোভন।

৬

মৃদু হাসি শশীমুখী অলকান্ত তুলি
হেরিলা তখন,
পীত ধড়া পীতাম্বর, গোপিনীর মনোচার,
শিকীপুচ্ছ চূড়া শিরে বাঁশরী বদন
দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গ শ্যাম, মনের মতন
পুরুষ রতন।

৭

যথা কোন বনদেবী পরিবিরহিনী
শোভার আধার,
ভ্রমিতে বিজন বনে, প্রাণপ্রিয় অন্বেষণে
বিলাসিত কাছে হেরি প্রণয়ী তাহার,
প্রফুল্ল কমল মুখ হইল রাধার
পেয়ে প্রেমাধার।

৮

দাঁড়াইলা কৃশোদরী আপন জমকে,
নয়নরঞ্জন
কুন্দ-শ্বেত-গ্রীবাশির ঃ উন্নত স্পর্ধিত ধীর,
নবমল্লিকার মালা চপলা যেমন
এক হাতে সূত্রে ধরা অর্দ্ধেক গাঁথন
শোভিল তখন।

৯

হাসিয়া সুন্দরী চুমি অনুরাগভরে

প্রাণেশ অধর,
বসাইলা করে ধরি, সৌরভে চৌদিক ভরি,
স্বর্ণসিনে, আলিঙ্গিয়া নবীন নাগর;
শোভিল যুগল মূর্তি কিশোরী কিশোর
চির মনোহর।"[৬৫]

এই কবিতাটির প্রকাশভঙ্গি, ছন্দ, ভাষা নৈপুণ্যে আমরা অনেকটা অবাক হই। তবে মধুসূদনের গীতি কবিতার সুর সুস্পষ্ট ছাপ তাতে পরিলক্ষিত হয়।

এ অঞ্চলে সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা রচনায় প্যারীচরণ দাস পথিকৃৎ ছিলেন। এবং এই সনেট ভাবনা বা প্রভাব কিন্তু মধুসূদন থেকেই পেয়েছেন। এখানে তাঁর একটা সনেট উল্লেখ করতে পারি—

পিতা

"নমি তাতঃ শ্রীচরণে আমার ঈশ্বর
এ ভব ভবনে তুমি; কত না আধারে
শিখাইলে লেখাপড়া; কিন্তু এ পামর
আজিও তোমারে ভুলে আছে প্রাণ ধরে।
আমি পুত্রাধম তব; অযোগ্য অসার
তোমার তুলনে; তুমি জ্ঞান পারাবার
বুদ্ধি বৃহস্পতি; দেশে লোক কোথা আর
যে তোমারে না জিজ্ঞাসে গুপ্ত কথা তার
বিকট সঙ্কট যবে, কিংবা ব্যবহার
বিষয়ের গাঢ়তম মীমাংসা কঠিন।
আরব্য, পারস্য, উর্দু বিদেশী ভাষার
বিজয়ী পণ্ডিত তুমি আর্য সমীচীন।
বিদ্যার গৌরব পুষ্পে,—বিষাদ আমার।
নারিণু পূজিতে পিতঃ চরণ তোমার।"[৬৬]

এছাড়া 'ভারতেশ্বরী' (১৮৭৭) কাব্যগ্রন্থটি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেছেন। এতে একটা জিনিস সুস্পষ্ট যে হেমচন্দ্র দ্বারা তিনি কোথাও না কোথাও উপকৃত হয়েছেন।

একটা কথা আমাদের মানতেই হবে যে রামকুমার নন্দী মজুমদার ও প্যারীচরণ দাসই এ অঞ্চলে প্রথম বৃহৎবঙ্গের সাহিত্যের মতো সাহিত্য রচনা করতে চেয়েছেন। হোক না কিছু অনুসরণ, প্রভাব ইত্যাদি। তাঁদের এই প্রচেষ্টা পরবর্তী উত্তরসূরির পথ প্রসস্ত হয়েছে এতে সন্দেহ নেই। তাদের প্রতিভা যদি না থাকত তবে তাঁরা কিছুই লিখতে পারতেন না। তাই সেই দিক দিয়ে তাঁদের ও তাঁদের রচনার ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট।

ভাষিক পটভূমি

বরাক উপত্যকার ভাষা সম্পর্কে আলোচনায় এগিয়ে যাওয়ার আগে ভাষাচার্য সুকুমার সেনের একটি মন্তব্য স্মরণ করা যাক্—

> "ত্রিপুরা ও কাছাড়ের সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা খুব বেশি হয় নাই এবং—সেই কারণেই কি?—সেখানে বাঙ্গালা ভাষার মর্যাদা শেষপর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। এমন কি কামতা-কামরূপের রাজসভায় সংস্কৃত-শাস্ত্রীদের প্রভাব এবং সংস্কৃতচর্চার প্রসার ক্রমশঃ বাড়িলেও রাজ্যের সমস্ত কাজে এমন কি বিদেশী রাজার সহিত পত্রব্যবহারে এবং বিদেশী শক্তির সহিত সন্ধি ও চুক্তিপত্রেও বাঙ্গালা ভাষারই ব্যবহার হইত। এখানে ফারসী তেমন আমল পায় নাই। কাজকর্মে বাঙ্গালা গদ্যের প্রথম ও ব্যাপক ব্যবহার ষোড়শ শতাব্দী হইতে ত্রিপুরা-কাছাড়-কামতা অঞ্চলেই পাইতেছি।"[৬৭]

এখান থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে সংস্কৃত শাস্ত্র ও ফারসী ভাষা 'খুব বেশি' চর্চা হয় নাই। তার একটা কারণ হল সংস্কৃত শাস্ত্র ও ফারসী ভাষা ততটা পৌঁছায় নি। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীতে ক্রমে বাংলা সংস্কৃতি ও ভাষা প্রসার লাভ করে। রাজসভায় সহজ ও সাবলীল ব্যবহারে রাজবংশ ভিন্ন হলেও তারা বাংলা ভাষা রাজ্যের মূল ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। এই ভাষা প্রতিষ্ঠার পিছনে প্রায় শতাব্দী বৎসরের প্রক্রিয়ায় ভাষা ও সংস্কৃতি আহরণ চলছিল।[৬৮] কিন্তু একটা কথা বলা যায় এখানে সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র চর্চা 'খুব বেশি' না হলেও সংস্কৃত ভাষায় রাজসভার আকর্ষণ ছিল এবং কয়জন রাজার সংস্কৃত ভাষায় যথেষ্ট দখল ছিল। রাজা গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ তো ভাগবতের শ্লোক অনুবাদ করে পদ রচনা করেছেন।[৬৯] আমরা অনুমান করি সে জন্য বাংলা সংস্কৃতি ও ভাষা আরও দ্রুত প্রসার লাভ করেছিল।

কাছাড়ি বা হেড়ম্ব রাজ্যের সবচেয়ে প্রাচীন শিলালিপিটির সময়কাল ছিল ১৫৭৬ সাল। ঐ শিলালিপিতে একটি মাত্র বাক্য লিখিত ছিল। তা হল—

''শুভমস্ত শ্রীশ্রীযুক্ত মেঘনারায়ণ দেবহা
চেঙ্গসা বংশজাত রাজহৈ মাইবাঙ্গারা
জ্যত পাথরে সিংহদ্বার বান্ধাইলেন শ—
বকাব্দাঃ ১৪৯৮ বিতেরীখ আষাঢ় ২৬।''[৭০]

রাজা মেঘনারায়ণের আমল ছিল ১৫৭৬ থেকে ১৫৮৩ সাল পর্যন্ত। তার থেকে অনুমান করা যায় রাজা মেঘনারায়ণের আগে গদ্যের ব্যবহার ছিল। তা না হলে তারা কোথা থেকে পাবেন বা একদিনে তো তারা ভাষার এত সংস্কার করতে পারবেন না। তাই বলা যায় অনেক বছরের ভাষার ব্যবহার, চর্চা ও উত্তরাধিকার তাদের হাতে এসে পৌঁছেছিল।

তারপর আরও বড় উদাহরণ হল বিভিন্ন সময়ে রাজাদের প্রদান করা আদেশপত্রগুলির প্রতিটি বাংলা ভাষায় লিখিত ছিল। মহারাজা কীর্তিচন্দ্র নারায়ণ (১৭৩৫-১৭৪৫) বরাক উপত্যকার বড়খলা অঞ্চলের মণিরাম লস্করকে উজির নিযুক্ত করেন এবং নিয়োগ পত্র প্রদান করেন। এই নিয়োগ পত্রটি এ যাবৎ প্রাপ্ত আদেশপত্রগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। নিয়োগপত্রটি বাংলা গদ্যের প্রমাণ ধারণ ও বহন করে। নিয়োগপত্রটি উল্লেখ করা হচ্ছে—

''শ্রীরা (মা)
স্বস্থি ঃ প্রচণ্ড দৌর্দণ্ড ভব প্রতাপ দাবা-
নল শলভিকৃত বৈরি নিকর শ-
রদিন্দু সুন্দর জশ হেড়ম্ব পুর-
পুরিত পুরন্দর শ্রী শ্রীজক্ত-
কির্ত্তিচন্দ্র নারায়ণ মহারাজা
মহা মহগ্র প্রচণ্ড প্রতাপেসু-
অভয় পত্র নিখনং
মিদং কার্জ্যঞ্চ-
আর বড়খলার চান্দ লস্করের বেটা-
মণিরামরে আমি জানি আ কাচারির-
নিঅমে উজির পাতিলাম এতে অখন-
অবধি তুমার উজিরর বেটা ও নাতি ও-
পরিনাতি আর ধারাসূত্র ক্রমে এই উ-
জির-হৈ আ-জাইব আর মজুন্দারের বে-
টা মজুন্দার হৈব বড় ভুই আর বে—
টা বড়ভুইআ হৈব এতধর্থে অভয় দিলা—
ম এতে কাল কাদাল (ক) কুনদিন এই বাক্য-

দড় কুন জনে না ভাড়িব (খ) আর চতুর সি-
মা পূর্বের বৈল্যা হাহর ও আভঙ্গ পানিশ্ছ-
মে তাহিরর পশ্চিমর শিন্না এই তা-
হিররে বড়খলার জায়রে (গ) দিলাম-
আর উত্তরে পানিঘাট-দক্ষিণে বড়-
বরাক এই পূর্বতর -চতুরস্বি মাত্র দিলা-
ম এতে কুব শন্দেহ না আছে আর রা-
জ্যর মনুস্ব জে জনে উজিরর বাক্যে-
না চলে মেল দেয়ন হেলা করিআ-
দেররঙ্গ করে খেম্মা ও জয়জুরা-
ইন বশায় তারে সর্ব্বদণ্ড করিমু এত-
ধর্মে অভয় (প) ত্র-দি (লা) ম-
ইতি শক ১৬৫৮ (তারিখ) ২৯ ভাদ্রশা"[৭১]

এছাড়া উল্লেখ করা যায়—

১। কাছাড়ি বা হেড়ম্ব রাজাদের আইন কানুন বাংলা গদ্যে লেখা হয়েছিল। এরকম তিনটি পুথি 'হেড়ম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি', 'হেড়ম্ব রাজ্যের ঋণদান বিধি' ও 'দাসদাসী বিষয়ক পুথি'।[৭২]

২। ১৭১৩ শকাব্দের বর্তমান হাইলাকান্দিতে জঙ্গল, জমি আবাদ ও বসবাস করার অধিকার সম্পর্কে ঘোষণাপত্র প্রদান করেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণ (১৭৮০-১৮১৩ সাল)।

৩। ১৭৩৪ শকাব্দে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রদত্ত কালাইনের আত্মারাম ভট্টাচার্যকে ভূমিদান পত্র।

৪। মহারাজা গোবিন্দচন্দ্র (১৮১৩-১৮৩০ সাল) কর্তৃক ১৭৪৬ শকাব্দে উদারবন্দের সোনারাম শর্মাকে উজির নিয়োগ করার পত্র।

৫। রাজা গোবিন্দচন্দ্র কর্তৃক ১৭৪৬ শকাব্দে জারি করা দেশমুখ্যের নিয়োগপত্র।

৬। ১৮২৪ সালে মহারাজ গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গে ইংরেজ গভর্ণর জেনারেলের চুক্তিপত্র।

এই সব নিয়োগপত্র, ভূমিদানপত্র, চুক্তিপত্র এ অঞ্চলের বাংলা গদ্যভাষার উজ্জ্বল নিদর্শন।[৭৩]

এখানে উদাহরণ স্বরূপ রাজা গোবিন্দচন্দ্রের একটি চিঠি উল্লেখ করা যায়—

৭শ্রী দুর্গা

''৭ প্রচণ্ড প্রতাপান্বিতশৌর্য্যগাম্ভিযৌদার্য্যাদিগুনগনাকরসগর্ব্বস পত্নবারনবিদারণ প্রচণ্ড পঞ্চাননকলিকাত্তাদীশ্বর শ্রীশ্রীযুত নবাব গবনর জংবাহাদুর প্রচণ্ডপ্রতাপসৎকীর্ত্তি প্রকাশীকৃতদিঙমণ্ডলমদাশ্রয়েযু পরমপ্রীতিপূর্ব্বক বিজ্ঞাপনমদঃ। পরং বিশেষ স্থেতাবান সমাচারঃ। একক নিরাশ্রয় জ্ঞানে আমাকে ভৃত্যলোকে উৎপাটন করিতে চেষ্টা পান তাহাকে নিরন্তর সন্দেহ বিষয় আমি শরনাপন্ন আমাদের আপন বহি আশ্রয়ান্তর নহি এহাতে যদ্যপি কম্পানী সরকারের ২০জন ছিপাহি আমার নিকট থাকেন তবে নিঃসন্দেহ ক্রমে আত্মরক্ষণপূর্ব্বক রাজ্য সম্ভোগ করিতে পারি অতএব গোচর করি মেহেরবানিপূর্ব্বক জিলা শ্রীহট্টের শ্রীযুত মেজেষ্টর সাহেবের প্রতি ২০ বিস জনা ছিপাহি আমার নিকট সদাকাল রাখিতে ১ এক কিত্তা পরাণার হুখুম হৈতে অনুমতি হবে এবং আমিহ সন বর সন নজরানা ৫ পাচ গোট হস্তি শ্রীযুত কম্পানী বাহাদুরের সরকারের দাখিল করিব এবঞ্চ ঐ ছিপাহিরার মাহিনা আমার সরকার হৈতে দেওআ জাবে কিমিধিকমিতি সন ১৭৩৮ সাল মাহে ১৫ --- আষাঢ় মহামহীন্দ্রমহিমার্ণবমহাসূরতাসেচনককলিকাত্তাদীশ্বর শ্রীশ্রীযুত নবাব গবনর জংবাহাদুর মহোগ্রপ্রতাপেষু—"[৭৪]

রাজ্যের আভ্যন্তরিন বিষয়বস্তু ছাড়া কাছাড়ি রাজারা রাজ্যের বাইরের যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা সাবলীল ভাবে ব্যবহার করতেন। এই চিঠিপত্রের মূল্যায়ন করে ঐতিহাসিক সূর্যকুমার ভূঞা বলেছেন—

> "There are six hisotrical letters exchanged between the Ahom, Jayantia and Cachar courts of the years 1795 to 1805 AD. The preambles are in Sanskrit and consist of strings of epithets describing the addressor and the addressee which reveal the religion and creed they profesced. The business portion of the letters is in Bangali, mutilated to a great extant by the infuence of Assamese syntax and vocabulary. Anyhow they are good specimens of Bengali as it was used for court purposes outside Bengali and in the absence of any extant Bengali prose writing for that period and even much later, these letters can be regarded as an extremely valuable acquisition to Bengali literature."[৭৫]

উপরের এইসব প্রমাণ তথ্য থেকে এটা সুস্পষ্ট যে কাছাড় (অবিভক্ত) সুদূর পনেরো শতাব্দীতেই বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতিকে আহরণ করে নিয়েছিল। এখানে গবেষক অমলেন্দু ভট্টাচার্যের মন্তব্য স্মরণ করা যায়—

> "শ্রীহট্টের ভাষা-সংস্কৃতি বঙ্গীয় ঐতিহ্যজাত। অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধির 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' এবং পরবর্তী সময়ে রচিত শ্রীহট্ট বিষয়ক বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থে এ সম্পর্কে পর্যাপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শ্রীহট্টের উল্লেখযোগ্য কবিরা হলেন মুরারী গুপ্ত, যদুনাথ কবিচন্দ্র, শংকর ঘোষ। মহাভারতের অনুবাদক গোপীনাথ দত্ত ও সঞ্জয় শ্রীহট্টবাসী। মঙ্গলকাব্যের উল্লেখযোগ্য কবিরা হলেন ষষ্ঠীবর, রাধানাথ দত্ত, বিনোদ রায়, রাধামাধব দত্ত, আনন্দরাম চক্রবর্তী প্রমুখ। শ্রীহট্ট অঞ্চল থেকে অজস্র বাংলা পুথি সংগৃহীত হয়েছে। 'শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ' গ্রন্থাগারে রক্ষিত বাংলা পুথির তালিকায় (প্রথম খণ্ড) ৪৭৯টি বাংলা পুথির পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। হেড়ম্ব রাজ্যের সীমান্তবর্তী তিনটি রাজ্য জয়ন্তিয়া, শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরার রাজদরবারে বাংলাভাষা ব্যবহৃত হওয়ায় স্থানীয় সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের প্রেক্ষাপটে হেড়ম্ব দেশের রাজারাও রাজভাষা হিসেবে বাংলাকেই গ্রহণ করেছিলেন।"[৭৬]

এই পর্যন্ত ঐতিহাসিক রাজনৈতিক প্রমাণ দ্বারা বুঝতে পারলাম যে বরাক উপত্যকার বাংলা ভাষার পটভূমি সুদূর ঐতিহ্যবাহী পরম্পরাগত। এ উপত্যকার বাংলা ভাষার পটভূমি, ঐতিহ্য, পরম্পরা, শেকড়, উত্তরাধিকার কিন্তু বৃহৎ বঙ্গেরই। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

আমরা জানি ভাষার একটা প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল ভাষা সব সময় গতিশীল। সমগ্র বঙ্গভাষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বাংলাভাষাকে তিনটি ভাগ করা যায়—

১। **গৌড়ীয় যুগ**—গৌড়ীয় যুগে গৌড়রাজ্য সমগ্র বাংলার আদর্শভূমি ছিল। এই যুগের বাংলা ভাষাই সমগ্র বঙ্গকে অবগাহণ করে বাংলা ভাষাকে প্রথম সমৃদ্ধি এনে দিয়েছিল। এই গৌড়ীয় ভাষা উড়িয়া, মাগধী, মৈথিলী, অসমিয়া প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল।[৭৭] কিন্তু পরবর্তী সময়ে সময়ের বাঁক বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা পরিবর্তন আসল গৌড়ীয় ভাষায়। পশ্চিমবঙ্গসহ অনেক অঞ্চল তা সাদরে গ্রহণ করল। তবে শ্রীহট্টে কাছাড়ে এ পরিবর্তনের জোয়ার আসল না। শ্রীহট্ট কাছাড়বাসী গৌড়ীয় বাংলা ভাষাকেই আকড়ে ধরেছিলেন বহু প্রজন্ম ধরে। এখানে আরও একটা জিনিস গভীরভাবে মনে রাখতে হবে যে মধ্যযুগের প্রাণপুরুষ হজরত শাহজালাল য়মণি তিনশ ষাট আউলিয়াসহ শ্রীহট্ট বিজয়ের (১৩১৪ সাল) পর থেকেই শ্রীহট্টের কোণায় কোণায় আরবি ও ফারসি ভাষা পৌঁছাতে লাগল। তাদের প্রভাবে মানবিকতা, সত্যবাদীতা, ন্যায়পরায়নতা, ঈশ্বর বিশ্বাস, ভ্রাতৃত্ববোধ ইত্যাদির দ্বারা হাজার হাজার ভিন্ন ধর্মী

মানুষ মুসলমান হতে থাকেন। এই মুসলমান হওয়ার পেছনে আরও একটা জিনিস কাজ করেছিল তা হিন্দুধর্মের ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া আদিপত্য, শাসন ও শোষণ। যেখানে নিম্ন বর্ণের, নিম্ন শ্রেণির মানুষের জায়গা অদ্ভুত ও শোচনীয় ছিল। এই বৈষম্য, ভেদাভেদ, বর্ণভেদ, শ্রেণী ভেদের কারাগার থেকে মুক্তি পাবার জন্য ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিলেন স্বেচ্ছায় স্বগৌরবে। কিন্তু এই ধর্ম পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামিক ভাষা, ধর্মকর্ম, পরম্পরা ইত্যাদির পরিবর্তনও হল। এখান থেকেই তাদের মাধ্যমে শ্রীহট্টে কাছাড়ের বাংলা ভাষায় আরবি ও ফারসি ভাষার শব্দ ক্রমে অনেকটা জায়গা দখল করে নিল। যা বৃহৎ বঙ্গে ততটা নয় কিন্তু। তাই শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের বাংলা ভাষায় আরও নতুন অনেক শব্দ সংযোজন হল। তবে একটা কথা আবার মনে রাখা উচিত এখানকার বাঙালি হিন্দুদের ভাষা বাংলাই রয়ে গেল। তাদের বাংলা ভাষা থেকে বাঙালি মুসলিমদের বাংলা ভাষার মত ততটা শব্দ নিজস্ব জায়গা থেকে সরতে পারেনি। যদিও পরবর্তী সময়ে অনেকটা পরিবর্তন এসেছে বিভিন্ন কারণে। এইসব মিলিয়ে যে বাংলা ভাষা শ্রীহট্টে কাছাড়ে সৃষ্টি হয়েছিল তা আজও বহমান।

২। **নদীয়া যুগ**—গৌড়ীয় বাংলা ভাষা নদীয়া যুগে বহু পরিবর্তন অর্জন করল। তার শেকড়ে পটভূমিতে শ্রীহট্টের যোগাযোগ সর্বাধিক উর্বরতা যোগান দিয়েছিল কিন্তু। মধ্যযুগের প্রাণপুরুষ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ছিলেন ঢাকা দক্ষিণের। তাঁর পিতৃভূমি ছিল শ্রীহট্ট। অদ্বৈত আচার্য, মুরারি গুপ্ত, শ্রীবাস পণ্ডিত, মাধব দাস, বৃন্দাবন দাস, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য, যদুনাথ কবিচন্দ্র, শংকর ঘোষ, গোপীনাথ দত্ত, রাধানাথ দত্ত, রাধামাধব দত্ত, আনন্দরাম চক্রবর্তী প্রভৃতি মনীষি ও চিন্তানায়কের জন্ম শ্রীহট্টেই কিন্তু। শ্রীচৈতন্যের প্রধান পার্ষদদের অধিকাংশের শ্রীহট্টেই জন্ম ও শেকড়।[৭৮] এবং শ্রীচৈতন্যকে ঘিরে বহু গুণীজন নবদ্বীপে মানবচেতনার জোয়ার বয়ে দিয়েছিলেন। নদীয়া যুগের সেই ভাব, জোয়ার, শ্রীহট্ট কাছাড় বাসীরা সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন যতটুকু তাদের কাছে এসে পৌঁছে ছিল। বিদ্যাপতি, ঘনরাম, মুকুন্দরাম, কৃত্তিবাস, চণ্ডীদাস, কাশীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবি, মধ্যযুগীয় অনুবাদক ও মঙ্গলকাব্যের রচয়িতা গৌড়ীয় যুগের সাহিত্য আচার্য। তাদের হাতে গৌড়ীয় সাহিত্য ও বঙ্গভাষা পূর্ণতা পেয়েছিল। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের মহাপুরুষের পার্ষদ ও শিষ্যভক্তগণের যারা বঙ্গভাষার আকাশ পর্যন্ত ছুঁয়েছিলেন তাঁরা হলেন নদীয়া যুগের সাহিত্য আচার্য। কিন্তু পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যিক বাঁক বঙ্গভাষাকে পুরাতন পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে নতুন বাঁকে চলতে শুরু করল।[৭৯] এবং তার সঙ্গেই একটা বৈপ্লবিক ও বিবর্তনশীল বাঁক এসে গেল যাকে বলা হয়ে থাকে কলকাতা যুগ বা আধুনিক যুগ।

৩। **কলকাতা যুগ**—কলকাতা যুগের স্রোত ও গতি শ্রীহট্টে ও কাছাড়ে ততটা গ্রহণ করতে পারেন নি। হয়তবা তাঁর কারণ ছিল ১৮৩৫ সালের ২৩শে ডিসেম্বর এডাম সাহেব গভর্ণমেন্ট দপ্তরে শিক্ষাসংক্রান্ত রিপোর্টের ভাষায়—

> "The Gour or Bengalee language is spoken with the greatest purity in this ditrict, but the men of rank becaming ashamed of their peculire accent endeavour, it is said, to imitate the less correct pronunciation of Calcutta the modern metropolis."[৮০]

একটা কথা তাঁর সঙ্গে মনে রাখতে হবে কলকাতা যুগের সময় শ্রীহট্টের কাছাড়ের উত্থানপতন হয়েছে অনেকবার। তাই গৌড়ীয় যুগ ও নদীয়া যুগের মতো বৃহৎবঙ্গের সঙ্গে শ্রীহট্ট কাছাড়ের সম্পর্ক, সংযোগ, মেলবন্ধন, ঘনিষ্ঠতা ইত্যাদি সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। ফলে শ্রীহট্টে কাছাড়ের বাংলা ভাষায় গৌড়ীয় ও নদীয়া যুগের ভাব, উচ্চারণ, শৈলী, প্রচলন, ব্যবহার অটুট রয়েই গেল। বরাক উপত্যকার জনমানসে যা আজও প্রবাহিত। শ্রীহট্ট, কাছাড়ের (বরাক উপত্যকার) কথ্যভাষা শুনে যারা হাজার বছর বয়সী বৃদ্ধার নাকের মতো কুচকানো নাকে নাক সিট্‌কাতে থাকেন তাদের উদ্দেশ্যে গৌড়ীয়, নদীয়া ও পরবর্তী যুগের আদর্শ ভাষা ও সাহিত্য থেকে কিছু উদাহরণ দিতে চাই। যেমন—

১। যাইমু, খাইমু প্রভৃতি ক্রিয়াপদ

"প্রভুবলে তোমরা সকলে যাহ ঘরে,
মুঞি আর না যাইমু সংসার ভিতরে।" (চৈতন্য ভাগবত—বৃন্দাবন দাস)

২। কেনে—কেন

"পিতামাতাগুরু—সখা ভাব কেনে নহে।
'প্রেমা'-র স্বভাব দাসভাব যে করায়ে।।" ('চৈতন্যচরিতামৃত'—কবিরাজ গোস্বামী)

অথবা

"রাই এমন কেনে বা হইল।
গুরু দুরজন— ভয় নাহি মন
কোথা বা কি দেবে পাইল।।" ("বৈষ্ণব পদাবলী'—চণ্ডীদাস)

৩। পাও—পা

"হাত পাও কাঁপে বুড়ী, কথায় বড়াই বুড়ি
প্রবোধবচন নাহি শুনে।" (মুকুন্দরাম চক্রবর্তী)

৪। ইতালাগি—এটার জন্য, কিতালাগি—কিসের জন্য প্রভৃতি

"অখিল লোচন— তমতাপবিমোচন
উদয়তি আনন্দ—কন্দে।
এক নলিন মুখ— মলিন করবে জানি
ইথে লাগি নিন্দহ চন্দে?" ('বৈষ্ণব পদাবলী'—বিদ্যাপতি ঠাকুর)

৫। গাম—গ্রাম

"গোপী গোপগরিম গুণ গোপক গোকুল গাম বিহারী।" ('বৈষ্ণব পদাবলী'—গোবিন্দ দাস)

৬। করগি—গিয়ে করো

"মোর ব্রতে বিশাই তুমি কর অবধান।
মহাবীরের ঘর বাড়ি করগি নির্ম্মাণ।।" (মুকুন্দরাম চক্রবর্তী)

৭। মাইলা—মারিলা, ধইলা, গেলা, প্রভৃতি ক্রিয়াপদ

"কৃষ্ণ কহ বলি জল ফেলি মাইলা।" ('চৈতন্যচরিতামৃত'—কবিরাজ গোস্বামী)

৮। গাং—নদী

"এ দাতে বিশ্বাস কিছু নাহি করি আর।
ভাংগন ধরিলে গাঙে রাখে সাধ্য কার।।" (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)

৯। পোলা—ছেলে, পোয়া—ছেলে

"হাড়ি মুচি যুগী জোলা— কত বা সেকের পোলা
জাঁকে জাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে চলে।" (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)

অথবা

"কৌশল্যা কহেন শুন কেকয়ীনন্দন,
মায়ে পোয়ে রাজ্য কর ভরত এখন।।" ('রামায়ণ'—কৃত্তিবাস ওঝা)

১০। বয়্যা—বয়ে, ফুরায়্যা—ফুরায়ে, প্রভৃতি

"শুনতো ভ্রান্ত অশান্ত মন, দিনত মিছা গেল বয়্যা।

ইন্দ্রিয় দশ, হতেছে অবশ ক্রমেতে নিশ্বাস যায় ফুরায়্যা।" (রাজা রামমোহন রায়)

১১। রাইত—রাত্রি

"ধৈরজ ধরণ নহে, ঝুরি দিন রাইতে,

হিয়ায় পুতুলি কাঁদে তোমার পীরিতে।" (কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী)

১২। তান—তাঁর, তানে—তাঁকে

"তথাপিও হেন তান মায়ার বড়াঞি" (চৈতন্যভাগবত—বৃন্দাবন দাস)

বা

"বাদীসিংহ বলিয়া পদবী দিব তানে" (চৈতন্যভাগবত—বৃন্দাবন দাস)

১৩। কেটা—কে সে

"কারে কর এ কৌতুক বুঝিবেক কেটা" (অন্নদামঙ্গল—ভারতচন্দ্র রায় গুনাকর)

এছাড়া মধ্যযুগের আদি বাংলা নিদর্শন থেকে শেষ নিদর্শন পর্যন্ত এই পুরো ধারাতেই পাওয়া যায় সিলেটি উপভাষায় প্রচলিত অসংখ্য শব্দ । যেমন—লড়াচড়া, লাড়ু, বান্ধা, কান্ধে, চান্দ, কান্দন, যাইমু, মাথাত, চিন্, ছাওয়াল, লাগ্, বাসা, বিহান, নাও, সিয়ান, সুতিলো, চকুত, লুড়া, রৌদ, ছাতি, গুয়াপান, উস্টা, সামাই, পিন্ধা ইত্যাদি। যা আজও বরাক উপত্যকার মানুষেরা ব্যবহার করে। তবে আজকাল ইংরেজি ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজের মানুষেরা সময়ের দাবিতে অঞ্চলিক রূপ এড়িয়ে মান্য বাংলায়ই কথা বলছেন।

এ রকম হাজার প্রমাণ ও উদাহরণ দিতে পারি। এখান থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট যে বরাক উপত্যকার ভাষা বাংলা ভাষা।[৮১] তবে কেন অধুনা শ্রীহট্ট কাছাড়ের বাইরের বাঙালিরা এখানের বাংলা ভাষাকে সৎ মা মনে করেন বুঝে ওঠতে পারি নাই আজ পর্যন্ত।

কলকাতা যুগের বাংলা ভাষার সঙ্গে শ্রীহট্ট কাছাড়ের বাংলা ভাষায় তফাৎ পার্থক্য ক্রমে বেড়ে ওঠেছে ১৮৭৪ সালের বঙ্গ ভাগ থেকে স্বাধীনতা লাভ ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগ পর্যন্ত। এবং তার পরবর্তী সময়েও তার রেশ প্রবাহিত। তবে বর্তমান সময়ে তা অনেকটা কেটে ওঠেছে। তার শেকড়ে ও পটভূমিতে উর্বরতা যোগান দিয়েছে বরাক উপত্যকার আধুনিকতার বিকাশ ও প্রসার। তাই বিশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে কলকাতার সঙ্গে ক্রমে যোগাযোগ ও মেলবন্ধন বৃদ্ধি হওয়ায় কলকাতা ও বরাক উপত্যকার বাংলা ভাষার মধ্যে সমতা ও ভারসাম্যতা ফিরে আসছে। তবে স্বাধীনোত্তর সময় থেকে তার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই এখানে বলা যায় কলকাতা, বাংলাদেশ, বরাক, ত্রিপুরার মাঝখানে কোনো তফাৎ পার্থক্য আর রইল না।

তবে আরও একটা জিনিস মনে রাখা উচিত উপরের মন্তব্যের পাশাপাশি যে ১৯৬০ সালে গোয়ালপাড়া জেলায় 'বঙ্গাল খেদা' বর্বরতার পর বাংলা মাধ্যম স্কুল তিনে দাঁড়ায়। কিন্তু ১৯৪৭-৪৮ সালে যেখানে ছিল ২৫০ টি বাংলা মাধ্যম স্কুল। অসমীয়াকরণে বাংলা প্রায় হারিয়েই গেল এখানে। এখানে উল্লেখ করতে ভালো লাগছে যে অথচ আধুনিক অসমিয়া সাহিত্যের প্রথম সারির প্রতিনিধিরা যেমন, লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া (অসমিয়া ছোট গল্পের জনক), পদ্মনাথ গোহাঞিবরুয়া (অসম সাহিত্য সভার প্রথম সভাপতি) চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা (অসমিয়া সাহিত্যে রোমান্টিক যুগের স্রষ্টা), ভবানন্দ দত্ত ('রবীন্দ্রপ্রতিভা' গ্রন্থের লেখক) প্রভৃতিরা কলকাতা থেকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।[৮২]

বরাক উপত্যকার বাংলা ভাষায় সত্যিকারের বিপ্লব এসেছে স্বাধীনোত্তর সময়ে অর্থাৎ ষাটের দশক থেকে। এখান থেকে কবিতার পাশাপাশি নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প ইত্যাদি সাহিত্যের শাখার বিকাশ ও প্রসার হতে শুরু করল। কবিতা সমালোচনা ও প্রবন্ধ পাশাপাশি উদ্ভিদের মতো গজিয়ে ওঠে ডালপাতাসহ আকাশে এক খণ্ড আকাশ জুড়ে

নিল। বরাক উপত্যকার একটা প্রধানতম প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতা যে আমরা অতীতে ইতিহাসে কালের হিসেব করি নাই। যদি কালের হিসেবে করতাম তবে আমাদের ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভাষিক ও সাহিত্যিক পটভূমিকে কালের বিশ্বকোষে সঞ্চয় করে রাখতে পারতাম। এবং আমাদের এই সব পটভূমি, শেকড়, পাতালতা, ডালপালা ইত্যাদিকে ভালো করে চিহ্নিত করতে পারতাম যে (কীভাবে, কেমনে, কী রকম করে) আমরা কী ছিলাম? আমাদের দুর্ভাগ্য খ্রিস্টফার কলম্বাস (ইটালিয়ান), ভাস্ক-ডা-গামা (পর্তুগীজ), আলবিরুণী (পারস্য), মেগাস্থিনিস (গ্রীক), হিউয়েন সাঙ (চিনা) এ রকম দু'একজন কাল চেতনাসম্পন্ন ঐতিহাসিক ও তথ্য সংগ্রহকারী চিন্তাবিদকেও পাইনি। তা না হলে আমরা আরও অনেক কিছু জানতে পারতাম—অনেক উপকৃত হতাম ঐতিহাসিক পটভূমিতে।

বরাক উপত্যকায় বাংলা শিক্ষা ও ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের ফলে ভাষিক পরিবর্তন এসেছে। তবে দুঃখের বিষয় যে বিশ শতকের শেষের দশক থেকেই ইংরেজি ভাষার প্রতি বরাকবাসী ঝুকে পড়ায় বাংলা ভাষার অবস্থাটা গোয়ালপাড়ার মত হয়েই যাচ্ছে। একুশ শতকে এসে দেখা যায় যারা ইংরেজি ভাষা জানে, ইংরেজিতে কথা বলতে পারে উনিশ শতকের ইংরেজদের দেওয়া সার্টিফিকেটের মত বাঙালিরাও ইংরেজি ভাষার সার্টিফিকেট দিতে শুরু করল। আজকের কলকাতা ও শিলচরে Black English দের ভিড় ক্রমে বাড়ছে। এই মানচিত্র দিয়ে সমগ্র বিশ্বের অনেক শহর ও অঞ্চলকে মাপা যায়।

কিন্তু এই জায়গায় আমি মনে করিয়ে দিতে চাই যে ইংরেজি ভাষার প্রচার ও প্রসার শুরু হয়েছিল বাণিজ্যিক কারণে ও উদ্দেশ্যে। ভারতবর্ষে ইংরেজরা বণিকের মানদণ্ডে এসে রাজদণ্ডে পরিণত হয়েছিল আজও সেই একই অবস্থা। জাপান বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে আছে, ২০১৭ সালে দ্বিতীয় হবে চীন। তার একটা বড় কারণ তারা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জাপানি ও চিনা ভাষার বামপাশে ইংরেজিকে সুবিধার্থে ব্যবহার কচ্ছে। তারা মাতৃভাষাকে শেকড়চ্যুত করেনি। অতীতের মত নেশায় ডুবে যাচ্ছে না, তাই আজ তারা এত উপরে ওঠতে পেরেছে। কিন্তু আমরা ক্রমে হারিয়ে যাচ্ছি। বাংলা ভাষার অসংখ্য শব্দকে টেনে সরিয়ে ইংরেজি শব্দকে জায়গা দিচ্ছি প্রতিদিন। এভাবে অসংখ্য শব্দ মরে যাচ্ছে প্রতিদিন আর আমরা আবার পরাধীন হচ্ছি ক্রমে। 'দুঃখিনী বর্ণমালা' মায়ের বুক কাঁকড়ার বাচ্চার মত খুঁড়ে খুঁড়ে খেয়ে শেষ করে দিচ্ছি। তুমি আমি আমরা যারা নিজেকে এখনও বাঙালি বলি! তোমার আমার আমাদের কী কোনও দায়িত্ব নেই এখানে?

বিশ শতকের প্রথম দিক থেকেই ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ বিশ্লেষণ করতে লাগলেন অনেক কালচেতনাসমৃদ্ধ ব্যক্তিবর্গ তাদের মধ্যে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, নীহাররঞ্জন রায়, থেকে শুরু করে পদ্মনাথ ভট্টাচার্য, অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি, উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ, কমলাকান্ত গুপ্ত, দেবব্রত দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ সেন, ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায়, জয়ন্তভূষণ ভট্টাচার্য, সুজিৎ চৌধুরী, অমলেন্দু ভট্টাচার্য প্রভৃতি। তাদের রচনার পাতা থেকে শ্রীহট্ট কাছাড়ের ইতিহাস, পটভূমির কথা পাওয়া যায়। বরাক উপত্যকার ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভাষিক, সাহিত্যিক এই পরিচয় সুদূর প্রাচীন, পরম্পরাগত, ঐতিহ্যবাহী। যা এই অধ্যায়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরার প্রয়াস করা হল।

তথ্যসূত্র—

বাংলা

১। কর, সুবীর—'বরাক উপত্যকার ভাষা সংগ্রামের ইতিহাস', পুস্তক বিপণী, কলকাতা-৯, ১৯৯৯, পৃঃ-১।

২। ভট্টাচার্য, জয়ন্তভূষণ প্রভৃতির (সম্পাঃ)—'শ্রীহট্ট কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির রূপরেখা', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, শিলং ১৯৯৬, পৃঃ-৭৯।

৩। তদেব, পৃঃ-৭৯।

৪। তদেব, পৃঃ-৮০।
৫। তদেব, পৃঃ-৮৫।
৬। তদেব, পৃঃ-৮৬।
৭। তদেব, পৃঃ-৮৭।
৮। পুরকায়স্থ, বিশ্বকল্যাণ ও শর্মা, রাজেশ (সম্পাঃ)—'পাগলবনে', চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, কার্তিক, শিলচর, ২০১৪, পৃঃ-৩১।
৯। চৌধুরী, সুজিৎ —'শ্রীহট্ট কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯২, পৃঃ-৭৫-৭৬।
১০। চৌধুরী, অচ্যুতচরণ—'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ', কলকাতা, ২০১০।
১১। তদেব, পৃঃ-১৭৪-১৯৪।
১২। তদেব, পৃঃ-১৭৪-১৯৪।
১৩। তদেব, পৃঃ-১৭৪-১৯৪।
১৪। তদেব, পৃঃ-১৭৪-১৯৪।
১৫। গুপ্ত চৌধুরী, কমলাকান্ত—'শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিহাস', কলকাতা ১৯৪০, পৃঃ-২।
১৬। ভট্টাচার্য, জয়ন্তভূষণ প্রভৃতির (সম্পাঃ)—'শ্রীহট্ট কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির রূপরেখা', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, শিলং, ১৯৯৬, পৃঃ-৯৮।
১৭। গুহ, উপেন্দ্রচন্দ্র—'কাছাড়ের ইতিবৃত্ত' (ভট্টাচার্য, অমলেন্দু ও দেবলস্কর, সঞ্জীব সম্পাঃ) পারুল প্রকাশনী, কলকাতা-৯, ২০১৬, পৃঃ-১৪-২৯।
১৮। তদেব, পৃঃ-২৩।
১৯। তদেব, পৃঃ-১৪-২৯।
২০। তদেব, পৃঃ-১৪-২৯।
২১। তদেব, পৃঃ-১৪-২৯।
২২। তদেব, পৃঃ-১৪-২৯।
২৩। পুরকায়স্থ, রমা—'বরাক উপত্যকার বাংলা সাহিত্যচর্চা', অমৃতলোক, মেদিনীপুর, ২০০৫, পৃঃ-২১।
২৪। ভট্টাচার্য, অমলেন্দু (সম্পাঃ)—'শ্রীনারদি রসামৃত', পারুল প্রকাশনী, কলকাতা-৯, ২০০২, পৃঃ-৫-৭।
২৫। তদেব, পৃঃ-৫-৭।
২৬। ভট্টাচার্য, জয়ন্তভূষণ প্রভৃতির (সম্পাঃ)—'শ্রীহট্ট কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির রূপরেখা', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, শিলং ১৯৯৬।
২৭ । চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার—'সাংস্কৃতিকী ৩য় খণ্ড', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯, পৃঃ-৮৭।
২৮। গুহ, উপেন্দ্রচন্দ্র—'কাছাড়ের ইতিবৃত্ত', (ভট্টাচার্য, অমলেন্দু ও দেবলস্কর, সঞ্জীব-সম্পাঃ), পারুল প্রকাশনী, কলকাতা-৯, ২০০৬।
২৯। তদেব, পৃঃ-৫-৭।
৩০। তদেব, পৃঃ-৭।
৩১। তদেব, পৃঃ-৮।
৩২। তদেব, পৃঃ-৭।
৩৩। তদেব, পৃঃ-৭।

৩৪। চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ ও মৈত্র, রমাকৃষ্ণ—'পৃথিবীর ইতিহাস' প্রথম খণ্ড, অনুষ্টুপ, কলকাতা-৯, ১৯৯৩।
৩৫। গুহ, উপেন্দ্রচন্দ্র—'কাছাড়ের ইতিবৃত্ত' (ভট্টাচার্য, অমলেন্দু ও দেবলস্কর, সঞ্জীব, সম্পাঃ), পারুল প্রকাশনী, কলকাতা-৯, ২০০৬, পৃঃ-৬।
৩৬। বসু, শিবতপন—'বরাক উপত্যকার লোক সংস্কৃতি', করিমগঞ্জ, আসাম, ২০০১, পৃঃ-১।
৩৭। ভট্টাচার্য, মুকুন্দদাস—'বরাক উপত্যকার লোকনৃত্য গ্রামীণ নৃত্যকলা', শিলচর, আসাম, ১৯৯৫, মুখবন্ধ।
৩৮। ভট্টাচার্য, জয়ন্তভূষণ প্রভৃতি (সম্পাঃ)—'শ্রীহট্ট কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির রূপরেখা', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, শিলং, ১৯৯৬।
৩৯। পুরকায়স্থ, রমা—'বরাক উপত্যকার বাংলা সাহিত্যচর্চা', অমৃতলোক, মেদিনীপুর, ২০০৫, পৃঃ-৩২।
৪০। চট্টোপাধ্যায়, সুহাস—'কাছাড়ে শিক্ষার ক্রমবিকাশ ১৯০০-১৯৯৯' বরাক প্রকাশন, শিলচর, আসাম, ২০০২।
৪১। চৌধুরী, অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি—'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত-পূর্বাংশ'—কলকাতা, ২০১০, পৃঃ-১৭৪-১৯৪।
৪২। ভট্টাচার্য, অমলেন্দু (সম্পাঃ)—'শ্রীনারদি রসামৃত', পারুল প্রকাশনী, কলকাতা-৯, ২০০৭, পৃঃ-৯-১৭।
৪৩। ভট্টাচার্য, জয়ন্তভূষণ প্রভৃতি (সম্পাঃ)—'শ্রীহট্ট কাছাড়ে প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির রূপরেখা' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, শিলং, ১৯৯৬, পৃঃ-৭৯-৯১।
৪৪। পুরকায়স্থ, রমা—'বরাক উপত্যকার বাংলা সাহিত্যচর্চা', অমৃতলোক, মেদিনীপুর, ২০০৫; পৃঃ-১৯।
৪৫। ভট্টাচার্য, জয়ন্তভূষণ প্রভৃতি (সম্পাঃ)—'শ্রীহট্ট কাছাড়ে প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির রূপরেখা', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, শিলং, ১৯৯৬।
৪৬। ভট্টাচার্য, অমলেন্দু (সম্পাঃ)—'শ্রীনারদি রসামৃত', ভূমিকা, পারুল প্রকাশনী, কলকাতা-৯, ২০০৭।
৪৭। তদেব
৪৮। তদেব।
৪৯। তদেব।
৫০। বর্মণ, মণিচরণ—'হৈড়ম্ব ভাষা প্রবেশ', (২য় সংস্করণ), বড়খলা, কাছাড়, আসাম, ১৩২০, পৃঃ-১।
৫১। গুহ, উপেন্দ্রচন্দ্র—'কাছাড়ের ইতিবৃত্ত', পারুল প্রকাশনী, কলকাতা-৯, ২০১৬, পৃঃ-১৪৩-১৪৬।
৫২। ভট্টাচার্য, অমলেন্দু (সম্পাঃ)—'শ্রীনারদি রসামৃত', পারুল প্রকাশনী, কলকাতা-৯, ২০০৭, পৃঃ- ১৩-১৪।
৫৩। ব্রহ্মচারী, শক্তিপদ ও চৌধুরী, বিশ্বতোষ (সম্পাঃ)—'ঈশানের পুঞ্জমেঘ', বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, শিলচর, আসাম, ১৯৯১, পৃঃ-৪।
৫৪। তদেব, পৃঃ-৪।
৫৫। গুহ, উপেন্দ্রচন্দ্র—'কাছাড়ের ইতিবৃত্ত', পারুল প্রকাশনী, কলকাতা-৯, ২০০৬।
৫৬। তদেব, পৃঃ-৮৩।
৫৭। পুরকায়স্থ, রমা—'বরাক উপত্যকার বাংলা সাহিত্যচর্চা', অমৃতলোক, মেদিনীপুর, ২০০৫, পৃঃ-২৫।
৫৮। গুহ, উপেন্দ্রচন্দ্র—'কাছাড়ের ইতিবৃত্ত', পারুল প্রকাশনী, কলকাতা-৯, ২০০৬, পৃঃ-২৫।
৫৯। মজুমদার, রামকুমার নন্দী—'বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য', (ভট্টাচার্য, অমলেন্দু ও সেন, জহরকান্তি সম্পাঃ) শিলচর, আসাম, ১৪০২।
৬০। তদেব।
৬১। শর্ম্মন, শ্রীহট্টবাসী—'রামকুমার জীবন চরিত', শিলচর, আসাম, ১৯১৭।
৬২। মজুমদার, রামকুমার নন্দী—'মালিনীর উপাখ্যান' (ভট্টাচার্য অমলেন্দু-সম্পাঃ) কলকাতা, ১৯৯৭।

৬৩। তদেব।
৬৪। চৌধুরী, অচ্যুতচরণ—'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' (উত্তরাংশ), শিলচর, আসাম, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ, পৃঃ-১৭৭।
৬৫। ভারতীয়া, সৌমেন ও বর্মণ, প্রসূন (সম্পাঃ)—'নাইন্থ কলাম ২০১১' গুহায়াটি, আসাম, ২০১১, পৃঃ-৩৯-৪১।
৬৬। তদেব, পৃঃ-৪৯-৫০।
৬৭। সেন, সুকুমার—'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খণ্ড), আনন্দ সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯১, পৃঃ-২০৭।
৬৮। তদেব।
৬৯। ভট্টাচার্য, অমলেন্দু (সম্পাঃ)—'শ্রীনারদি রসামৃত', পারুল প্রকাশনী, কলকাতা-৯, ২০০৭, পৃঃ-৭-৮
৭০। ভট্টাচার্য, অমলেন্দু— 'বরাক উপত্যকার বাংলা সাহিত্যচর্চার ধারাবাহিক ইতিহাস', অক্ষরবৃত্ত, তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা ১৯৯৩, পৃঃ-৩১।
৭১। ভূঞা, সূর্য্যকুমার (সম্পাঃ)—'তুংখঙ্গীয়া বুরঞ্জী', (তৃতীয় সংস্করণ) আসাম, গুয়াহাটি, ১৯৯০ পৃঃ-২৬
৭২। ভট্টাচার্য, অমলেন্দু (পুনঃ সম্পাঃ)—'হেড়ম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি' ও 'হেড়ম্ব রাজ্যের ঋণদান বিধি', (পদ্মনাথ ভট্টাচার্য সম্পাঃ), বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, শিলচর, আসাম, ২০০৩, পৃঃ-২১
৭৩। ভট্টাচার্য, অমলেন্দু (সম্পাঃ)—'শ্রীনারদি রসামৃত', পারুল প্রকাশনী, কলকাতা-৯, ২০০৭, পৃঃ-১৮-২৫। ও পুরকায়স্থ, রমা—' বরাক উপত্যকার বাংলা সাহিত্যচর্চা', অমৃতলোক, মেদিনীপুর, ২০০৫, পৃঃ-১৬-৩০।
৭৪। সেন, সুরেন্দ্রনাথ (সম্পাঃ)—'প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সংকলন', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২, ১৫৭ নং পত্র, পৃঃ-১৮৯-৯০।
৭৫। ভূঞা, সূর্যকুমার (সম্পাঃ)— 'তুংখঙ্গীয়া বুরঞ্জী', (তৃতীয় সংস্করণ) গুয়াহাটি, আসাম, ১৯৯০ পৃঃ-২৬
৭৬। ভট্টাচার্য, অমলেন্দু (সম্পাঃ)—'শ্রীনারদি রসামৃত', পারুল প্রকাশনী, কলকাতা-৯, ২০০৭, পৃঃ-৮
৭৭। কর, সুবীর—'বরাক উপত্যকার ভাষা সংগ্রামের ইতিহাস', পুস্তক বিপণী, কলকাতা-৯, ১৯৯৯, পৃঃ-১৫১-১৭১।
৭৮। তদেব।
৭৯। তদেব, পৃঃ-১৫৮।
৮০। তদেব, পৃঃ-১৫৮।
৮১। ভট্টাচার্য, জয়ন্তভূষণ প্রভৃতির (সম্পাঃ)—'শ্রীহট্ট কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির রূপরেখা', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, শিলং, ১৯৯৬, পৃঃ-১৮২-২০৯।
৮২। গগৈ, লীলা (সম্পাঃ)—'আধুনিক অসমিয়া সাহিত্যের পরিচয়', ডিব্রুগড়, আসাম, ১৯৯০।

English

1. Stallworthy, Jon & Ramazani, Jahan (Ed)"The Norton Anthology of English Literature– The Twenthieth Century and After," (8th Ed), W.W. Norton & Company, 500 fifth Avenue, New York– 10110, 2006, Page No-2040.
2. Lucy, Nail–"Postmodern Literary Theory," Blackwell Publishers LTD, UK, 1997, Page No-42-63.
3. Gait, Edward– "The History of Assam," Calcutta, 1967, Page No-326.
4. Carter, Ronald & McRae, Johan–"The Routledge History of Literature in English, Britain and Ireland," Routledge, London, 1997, Page No-16.